মনিকা

– ডিডি হায়দার

মেঘনাকে বিয়ের পর রঙ চা–টা দুধ চায়ের চেয়ে বেশি উপাদেয় মনে হতো আমার কাছে। আদা কিংবা লেবু মিশ্রিত চমৎকার রঙ চা আমাকে দারুণ এক শান্তির জগতে নিয়ে যেতো নিমেষেই। তবে আমার বন্ধুরা দুধ চা পছন্দ করতো বলে ওরা যখন বাসায় আসতো তখন দুধ চা–ই বানাতে হতো।

মাঝে মধ্যে চায়ে দুধের পরিমাণ একটু কম হলে বন্ধু মুজিব একটু আপত্তি করলে বন্ধু আজম তাকে ভাবীর সুউচু পর্বতের (?) কথা মনে করিয়ে দিতো। বলতো বাসায় গিয়ে দুধের ঘাটতিটা পুষিয়ে নিস।

বন্ধু জিয়ার বাসায় সাপ্তাহিক আড্ডায় সব সময় রঙ চা–টাই আমরা পছন্দ করতাম। ভাবীর চমৎকার হাতে বানানো আলু কিংবা মাংসের চপের সঙ্গে বিশেষ যত্নে বানানো রঙ চা খেয়ে আমাদের আড্ডাটা জমে উঠতো বেশ। তবে মুজিবের এক পরকীয়া প্রেমের হঠাৎ দর্শক হয়ে যাওয়ায় এবং তা মুজিবের বৌয়ের কানে পৌছে দেয়ার বিশেষ দায়িত্বটাও পালন করায় জিয়াভাবীর প্রতি মুজিবের একটা চাপা ক্ষোভ ছিল।

জিয়ার বাসায় চায়ের আড্ডায় চা–টা একটি পানির গ্লাসে ঢেলে নিয়ে বিশেষভাবে রঙটা পরখ করতো মুজিব। জিয়াকে খোচা দিয়ে বলতো, চায়ের রঙটা একটু বেশি লাল মনে হচ্ছে। আচ্ছা, ভাবীর কি এখন ইয়ে চলছে? ইঙ্গিতটা পুরোপুরি ধরতে পেরে জিয়া কপট রাগে বলতো, লাল রঙটা নিউট্রাল করার জন্য আমরা সবাই মিলে বরং ভাবীর কাছেই যাই, কি বলো।

মুজিব পাল্টা খোচা হজম করতো।

অফিসের রঙ চা–টা আরো বেশি উপাদেয় মনে হতো আমার কাছে। যে বায়িং হাউসে দীর্ঘ পাচ বছর ধরে কাজ করছি তাতে প্রথম দিকে দুধ চায়ের ব্যবস্থা থাকলেও গত দুই বছর ধরে কৃচ্ছতার অজুহাতে চা–টাই বন্ধ। তবে এমডির অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য তার সুন্দরী অবিবাহিতা দুই পিএস মনিকা ও রেশমার ভান্ডারে সব সময় চায়ের কাচামাল মজুদ থাকতো। তাই আমি ও কলিগ সাজিদভাই সকালবেলা চা খাওয়ার জন্য তাদের শরণাপন্ন হতাম। পিএসদ্বয়ের মাধুরীমার্কা হাসির সঙ্গে আদা–লেবু মিশ্রিত রঙ চায়ের স্বাদ আমাদের দেহ ও মন চাঙ্গা করতো নিঃসন্দেহে।

কখনো কখনো আমাদের চায়ের আসরে যোগ দিতেন আমাদেরই ডিজিএম, সর্বকাজের কাজি, বাক্যবাগীশ সায়গলভাই। ইনডিয়ান র‌্যাপ গানের শিল্পী বাবা সায়গলের মতো গান গাইতে পারেন বলে তিনি মাঝে মধ্যে দাবি করেন। তাই দাবির প্রতি সম্মান দেখিয়ে তার আসল নামের পরিবর্তে তাকে আমরা সায়গলভাই নামেই ডাকতাম। তাতে তিনি বেশ খুশিই হতেন। তিনিও রঙ চায়ের ভক্ত ছিলেন।

আমরা কখনো দুধ চায়ের কথা বললে তিনি বলতেন, এখন রঙ চা–ই খান। যাওয়ার সময় একটু দুধ (?) না হয় আলাদা করেই খেয়ে যাবেন। দুটো মিলে চমৎকার দুধ চা হবে, ঠিক না?

তবে রঙ চা আর দুধ চা খাওয়ার এ সময় পরিক্রমায় এক সময় মনিকার আকর্ষণের তীরে বিদ্ধ হলাম। মাঝে মধ্যে এমডি দেশের বাইরে গেলে পিএসদ্বয়ের কাজ থাকতো না। এ অবস্থায় রেশমা কখনো কখনো তাড়াতাড়ি বাসায় চলে গেলে মনিকা থাকতো একা। বৈকালীন চা খাওয়ার অজুহাতে তার কাছাকাছি হওয়ার সুযোগে নিজেকে তখন কল্পনা করতাম বিল ক্লিনটন রূপে আর এমডির চেম্বারটা তখন আমার কাছে মনে হতো হোয়াইট হাউস। মনিকার হাসি ও চোখের চাহনির মাঝে সীমা লঙ্ঘনের আহ্বান প্রত্যক্ষ করতাম। ভাবতাম, একি পরকীয়া নয়?

মনিকা একবার বলেছিল, অফিসের বিবাহিত পুরুষরাই আমাকে বেশি জ্বালাতন করে।

মনে মনে ভাবি, আমিও তো তাই। কিন্তু বিল ক্লিনটনও তো বিবাহিত ছিলেন। তার প্রেমে কি মনিকা মজেনি?

এক সময় সব ভুলে দেশি মনিকার প্রেমেই হাবুডুবু খেতে লাগলাম। পরিণতি কি হবে জানি না। আমি এখন রঙ চা, দুধ চায়ের ঘোরচক্রে এক অনিশ্চিত মোহে সমর্পিত। আমি কি এখন দুধ চা খাবো? আহ মনিকা! আহ দুধ চা!

চেরাগী পাহাড়, চট্টগ্রাম থেকে

দুষ্ট মেয়ের মিষ্টি হাত

– মোহাম্মদ ফরহাদুল কবির

আমি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান। আমার পিতা একজন শিক্ষক। আমরা প্রত্যন্ত গ্রামে থাকতাম। সে হিসেবে ছোটবেলায় দাদার দিকের কাউকেই চা খেতে দেখিনি। কেবল মনে আছে, কারো খুব কাপুনি দিয়ে জ্বর এলে চায়ের মধ্যে তেজপাতা দিয়ে এক ধরনের অদ্ভুত চা তৈরি করে খাওয়ানো হতো। তাও নেহায়েতই অসুবিধা বোধ করলে।

কাকতালীয়ভাবে এতে কিছু কাজও হতো।

আমার নানাবাড়ির চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা ধনী ছিলেন বলে চা তাদের জড়িয়ে ধরেছিল বেশ আগে থেকেই। আমার তিন খালার সবাই শহরে বাস করতেন বলে তারাও চায়ে ছিলেন অভ্যস্ত।

যখনই আমরা নানাবাড়িতে যেতাম, চা প্রসঙ্গ এলেই শুনতাম বেশ গলা হাকিয়ে বলা হচ্ছে, এই, চা পাচ কাপ কম করিস।

আসলে আমরা ছিলাম পাচ সদস্য বিশিষ্ট পরিবার। আমরা যখন অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকতাম তখন আমার খালাতো ভাইবোনরা হয়তো চায়ের কাপে ঝড় তুলছে পুরোদমে। সত্যিই উপভোগ্য দৃশ্য বটে! তারপর একটি নির্দিষ্ট স্তর পেরিয়ে গেলাম। আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল শিশুকালের সেই মুহূর্তগুলো যা আর কখনোই ধরা সম্ভব হবে না।

তারপর হাই স্কুলের গণ্ডিটাও কাটলো চা সঙ্গহীন। এক সময় স্কুল পেরিয়ে কলেজ প্রাঙ্গণে পা রাখলাম। তখন প্রায়ই বন্ধুদের সঙ্গে চা স্টলে বসে চা খেতাম। একবার চা খেলে আর দুই সপ্তাহ ওমুখো হতাম না। কারণ বন্ধুদের অনুসরণ করে শব্দহীন চা খেতে গিয়ে প্রায়ই ঠোঁট ও জিভের বারোটা বাজিয়ে ছাড়তাম।

তারপর ইন্টারমিডিয়েট শেষের দিকে ডিগ্রির এক বড়ভাই আমাকে শেখালেন কি করে শব্দহীনভাবে চা খেতে হয়। মনে আছে, সেদিন সন্ধ্যায় প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিয়ে ত্রিশ কাপ চা খেয়ে ফেলেছিলাম। চা বিক্রেতা তো আমাকে জিজ্ঞাসাই করে বসলো আমার বড় ধরনের কোনো রোগ-টোগ হয়েছে কি না। যা মনে হলে আজও মনে মনে না হেসে পারি না। সেদিন চা বিক্রেতার হাতে প্রায় শখানেক টাকা গছিয়ে দিয়ে অসাধ্য সাধনের তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম।

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার, আমি চা খাওয়ার বেলায় যতোটা অনভিজ্ঞ ছিলাম ঠিক ততোটাই পারঙ্গম ছিলাম বন্ধুদের মাতিয়ে রাখতে। বন্ধুদের বাসায় তেমন একটা যেতাম না।

একদিন এক বন্ধুর পীড়াপীড়িতে তাদের বাড়িতে যেতে বাধ্য হলাম। সেখানে গিয়ে দেখি বন্ধু মহলের প্রায় সবাই উপস্থিত। দুই তিনটি মেয়েও ছিল যাদের নিয়েই মূলত হই চইটা হচ্ছিল বেশি।

আমার স্বভাবসুলভ কারণে তাদের থেকে দূরেই থাকলাম। এমন সময় বন্ধুর বোন উঠে গেল এবং কিছুক্ষণ পর চা বিস্কিট নিয়ে ফিরে এলো। সবাইকেই দেয়া হলো। যখন আমি চায়ে চুমুক দিলাম তখন বুঝতে পারলাম আমার চায়ে দুধ চিনির বদলে কেবলই লবণ দেয়া হয়েছে। হেরে যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করে মুখে অত্যন্ত পরিতৃপ্তির ভাব ফুটিয়ে চা শেষ করলাম। মেয়েগুলো একটু পর পর আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল যে, চায়ে সব ঠিক হয়েছে কি না।

আমি হ্যাসূচক মাথা ঝাকাতেই তাদের মুখ মলিন হয়ে গেল। বোধ করি মেয়েগুলো দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত কাজের সার্থকতা খুজে না পেয়ে হতাশ হয়েছিল।

কিছুক্ষণ পর বিদায় নিয়ে চলে আসছি, এমন সময় পেছন থেকে মেয়েটি বললো, ভাইয়া, আমি তো আপনার চায়ে লবণ ছাড়া কিছুই দিইনি। কিন্তু আপনি সবার সামনে প্রশংসা করলেন, তৃপ্তি সহকারে খেলেন, ব্যাপার কি?

দেখুন, মূল জিনিসটা তো ঠিকই ছিল। সবাই চা খেয়েছে। আমিও খেয়েছি। চায়ের মধ্যে কি ছিল সেটা মুখ্য নয়। তাই না?

ভাইয়া আমার ভুল হয়ে....।

আমি তাকে মাঝ পথে থামিয়ে দিলাম।

দেখুন, আসলে কখনোই আশা করি না যে, সবাই আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। কারণ আমিও তো ততোটা বোধহয় করি না।

এরপর মেয়েটিকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই চলে এলাম।

পরে অবশ্য সেই দুষ্টু মেয়েটির মিষ্টি চা আমাকে খেতে হয়েছিল। হয়েছিল বললে ভুল হবে। কারণ এখনো খাচ্ছি। সে এখন আমার আদরের বৌ। এখন আমার ঘুম ভাঙে তার মিষ্টি হাতের চা খেয়ে।

নারায়ণগঞ্জ থেকে

ওয়াদা

– ইমতিয়াজ

হাসান সাহেব আজ তার বড় ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে যাচ্ছেন। সামাজিকভাবে মেয়ে দেখা। যদিও ছেলে তার জন্য মেয়ে আগে থেকেই পছন্দ করে রেখেছে। বাবাকে ভয় পায় বলে ছেলে তার মাকে ম্যানেজ করেছে। সব কিছু জানতে পেরে তিনিও আর আপত্তি করেননি। এখন ছেলের মা–বাবা যাবেন আর সামাজিকতা পালন করবেন। হাসান সাহেব ভাবেন আজকালকার ছেলেমেয়েরা কতো মুক্ত। তার ছেলের বাবা যতো রাশভারীই হোন না কেন, তিনি ছেলের ইচ্ছায় বাধা দিচ্ছেন না। ছেলেও তার পছন্দের মেয়েকে পারিবারিক সম্মতি অনুযায়ী বিয়ে করতে পারছে।

হাসান সাহেবদের সময়ের কথা মনে পড়ে। তাদের সময়ে যে প্রেম ভালোবাসা হতো না তা নয়। তবে অধিকাংশই তাদের পরিণতিতে পৌছাতে পারতো না। এক্ষেত্রে পরিবার একটা বিরাট বাধা হয়ে দাড়াতো। তখন দেখা যেতো যে, মেয়ের ভাই এসে ছেলেকে হুমকি দিতো বা মারধর করতো কিংবা মেয়ে নিজেই সব কিছু অস্বীকার করতো।

তার নিজের ক্ষেত্রেই এ রকম হয়েছে। তাদের সঙ্গেই পড়তো আফরিন। আফরিন সুলতানা। আফরিনের হাসি–ঠাট্টা, কথা–বার্তা, হাসানের দিকে কেমন করে তাকানো, সব কিছুই হাসানকে ধীরে ধীরে তার প্রতি দুর্বল করে দেয়। আস্তে আস্তে নেহায়েতই পরিচিতজন থেকে তারা অনেক ঘনিষ্ঠজন হয়ে পড়ে। এক সময় ক্যাম্পাসের পরিচিত জুটি বাইরেও পরিচিত হয়ে পড়ে।

কিছুদিন ক্লাসে না আসায় আফরিনের বাসায় এক সময় অস্থির হাসান গিয়ে হাজির হন।

না, আফরিনের বাসায় কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। আফরিনের মা তাকে অনেক কথা বুঝিয়ে বলেছিলেন। তার মধ্যে তুমি এখনো ছাত্র, ক্লাসমেটের সঙ্গে বিয়ে হয় কিভাবে। বাবা, ওর ভাইয়েরা শুনলে তোমার কি হবে, তার ছোট বোনদের তো বিয়ে দিতে হবে ইত্যাদি অনেক কথা বলেছিলেন যা আজ আর তার মনে নেই।

তিনি শুধু আফরিনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন।

এক সময় আফরিন এলো, তার চোখে চোখ রেখে সব কিছু অস্বীকার করলো।

তিনি যেই চোখে ভালোবাসা খুজে পেতেন, তা আজ আর চিনতে পারলেন না। হাসান বুঝতে পারলেন তিনি তার ভালোবাসা হারিয়েছেন।

পরে তিনি অনেক ভেবেছেন, হয়তো পারিবারিক চাপে আফরিন এটা করেছে। তারপরও তার মনে হতো, সব কিছু তুচ্ছ করে এই বুঝি আফরিন তার কাছে ফিরে আসে। তিনি উদগ্রীবভাবে তাকিয়ে থাকতেন কখন রাস্তা দিয়ে আফরিন ক্লাসে ঢোকে। তবে আফরিন আর কোনোদিনই আসেনি। সে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল।

পাগলি একটা, মনে মনে ভাবেন হাসান সাহেব, একবার আফরিনের সামনে এক ভাবীর হাতে বানানো চায়ের খুব প্রশংসা করেছিলেন হাসান। আফরিন পরদিন তার হলে এসে তাকে তার হাতে বানানো চা খাইয়েছিল এবং সেই চা খেয়ে তাকে ওয়াদা করতে হয়েছিল তিনি আর অন্য কারো হাতে বানানো চা খাবেন না।

কালের প্রবাহে অনেক কিছু ভুলে গিয়েছেন হাসান সাহেব। কিন্তু তার ওয়াদা ভোলেননি। তিনি এখনো কারো হাতে বানানো চা খান না।

হাসান সাহেব ভাবেন, তার সময়ে তিনি পারেননি। কিন্তু তার ছেলে পারছে, সে তার ভালোবাসাকে পাচ্ছে। ছেলের মায়ের মুখে তিনি শুনেছেন, মেয়ের মা-বাবারও এ বিয়েতে অমত নেই। যদিও তার ছেলে এখন ছাত্র এবং মেয়ের ক্লাসমেট তবুও হয়তো মেয়ের চাপে মা-বাবা অমত করেননি। তারা আজ গিয়ে মেয়েকে আংটি পরিয়ে আসবেন।

গাড়ি এসে তার বাড়ির সামনে থামে। হাসান সাহেব ফ্রেশ হয়ে কাপড়-চোপড় পাল্টে সপরিবারে ছেলের হবু বৌ দেখতে রওনা হলেন।

মেয়ের বাসায় তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে বসতে দেন মেয়ের বাবা। মেয়ের অন্য আত্মীয়স্বজনও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। মেয়ের মামা জানালেন, মেয়েকে একটু সাজিয়ে নিয়ে আসছেন।

হাসান সাহেব বুঝতে পারলেন না, মেয়েকে সাজানোর কি আছে? তিনি তার স্ত্রীকে ভেতরে যাবার ইঙ্গিত করলেন।

মেয়ের বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে হাসান সাহেব আলাপ জমিয়ে তুললেন। এমন সময় মেয়েকে নিয়ে মেয়ের মা ও তার স্ত্রী ঘুরে ঢুকলেন।

মেয়েকে হাসান সাহেব আগে দেখেননি, এখনো তাকে দেখার সময় পেলেন না।

তিনি তাকিয়ে থাকলেন মেয়ের মায়ের দিকে। এটি তার কাছে এমন এক সুখ যা কখনো পুরনো হবে না। আফরিনও তাকে দেখে চমকে গিয়েছিলেন। তবে তিনি দ্রুতই সামলে নিলেন। সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে লাগলেন। হাসান সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হবার সময় শুধু একবার সালাম করলেন।

ভদ্র হিসেবে পরিচিত হাসান সাহেব সেই সালামের কোনো উত্তর দিলেন না।

মেয়ের বাবা নাশতা খাবার জন্য তাদেরকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

হাসান সাহেবের কিছু খাবার রুচি আগেই চলে গিয়েছিল। তিনি কোনো কিছু স্পর্শ করলেন না।

বেয়াই সাহেব কিছু নিচ্ছেন না দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন মেয়ের বাবা। বেয়াই সাহেবকে খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। এক সময় ব্যর্থ হয়ে তিনি তাকে অন্তত এক কাপ চা খেতে অনুরোধ করতে লাগলেন। তিনি বললেন, আমার স্ত্রী খুব ভালো চা বানাতে পারে। একটু খেয়েই দেখুন না বিয়াই সাহেব।

এই সময় তার গাধা ছেলে মহা উৎসাহ ভরে বলতে লাগলো, বাবা তো চা খান না। আমরা আজ পর্যন্ত বাবাকে চা খেতে দেখিনি।

কেন? ওনার কোনো শারীরিক সমস্যা আছে নাকি? মেয়ের আত্মীয়স্বজনরা জিজ্ঞাসা করলো।

নাহ, বাবার কোনো সমস্যা নেই। গর্বভরে তার ছেলে বলে চলেছে, বাবা এমনিই চা খান না।
হাসান সাহেব আফরিনের দিকে তাকালেন। আফরিন মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছেন।
মেয়ের বাবা বলে ওঠেন, কি আশ্চর্য ব্যাপার বলুন দেখি! আপনি যেমন চা খান না তেমন আমার স্ত্রীও তার মায়ের সঙ্গে অভিমান করে অনেক দিন চা বানান না। আজ মেয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে চা বানিয়েছেন।
আমরাও আজ পর্যন্ত মাকে চা বানাতে দেখিনি। হবু দুলাভাইয়ের উদ্দেশ্যে বলে মেয়ের ছোট বোন।
অভিমান কেন? হাসান সাহেবের স্ত্রী প্রশ্ন করেন।
আর বলবেন না, আমার স্ত্রী ছাত্রী অবস্থায় খুব সুন্দর চা বানাতেন। একদিন নাকি তার মা বলেছিলেন, তুমি তো চা মোটামুটি বানাও, তা তোমার বিয়ে হওয়ার আগে ভালো চা বানানোটা শিখে নিও। ব্যস, অমনি সে চা বানানো ছেড়ে দিয়েছে। কি বলবো বেয়াইন সাহেবা, আমিও তার হাতে বানানো চা আজ প্রথম খেলাম।
আফরিন এখন আর মেঝের দিকে তাকিয়ে নেই। তিনি তাকিয়ে আছেন হাসান সাহেবের দিকে।
তার দিকে তাকিয়ে হাসান সাহেবের মনে হলো, তিনি কিছু হারাননি। তার ভালোবাসা পরাজিত হয়নি। তিনি আফরিনকে স্ত্রী হিসেবে পাননি। আফরিনও তাকে স্বামী হিসেবে পায়নি। কিন্তু তারা একে অপরকে পেয়েছেন হৃদয়ের পূর্ণতায়। তাদের মন শুধু তাদেরই একে অপরের দখলে। হাসান সাহেব শুধু নিজের কষ্টটাই দেখেছেন। তিনি কখনো জানতে চাননি, আফরিনের কোনো কষ্ট হচ্ছে কি না। তার সব সময় মনে হয়েছে সে হয়তো খুশিই হয়েছে তাকে অপদস্থ করতে পেরে।
আজ এখানে তার সামনে আফরিন একজন মধ্য বয়স্কা নারী রইলো না। যেন সে হয়ে গেল সেই অভিমানী মেয়েটি যে সকালবেলা ফ্লাস্কে চা এনে বলেছিল, এই চা খাও এবং বলো অন্য কারো হাতে বানানো চা আর কখনো খাবে না। তিনি তখনো তার আহ্বান এড়াতে পারেননি, আজও পারলেন না।
তার স্ত্রী ও পুত্রকে বিস্মিত করে তিনি চায়ের কাপের দিকে হাত বাড়ালেন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা থেকে

বিব্রত

– সৈয়দা ফাতিমা হেনা

এমফিলটা শেষ করার আগেই জাপানে চলে গেলাম। ওখানে যাওয়ার এক সপ্তাহ পরই প্রথম একজন জাপানিজের বাসায় বেড়াতে গেলাম। লোকটি ছিল আমার হ্যাজব্যান্ডের স্থানীয় অভিভাবক মি. ওরাতা। তার বাসাটা ছিল টোকিওর বাইরে সাইতামা কেনে। ওখানে আবার শহর এবং গ্রামের পার্থক্য তেমন নেই। তবুও মনে হয় শহরের মতো না। রেলস্টেশন থেকে নেমেই বেশ একটু হেটে যেতে হয়।
ভদ্রলোক রেলস্টেশনেই আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। আমাকে কাছে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হলেন। তখনো বাংলাদেশি মেয়ে তেমন একটা নেই।
হাটতে মন্দ লাগছিল না। মনে হলো বনের ভেতর দিয়ে চলছি। জায়গাটি তোকোরোজাওয়া। রাস্তার দুই পাশে প্রচুর বড় গাছ। দুর্ঘটনা অথবা বনের সৌন্দর্য রক্ষার জন্য লোহার রড দিয়ে রাস্তা বেধে দেয়া হয়েছে।
ওরাতাসান–এর (সান অর্থ মিস্টার) বাড়িতে তার শাশুড়ি ও বৌ বাস করেন। একটি মাত্র ছেলে অন্যত্র বসবাস করে। আমাদের সাড়া পেয়ে বৌ (স্থানীয় মা) এবং বৃদ্ধা শাশুড়ি বেরিয়ে এলো। তাদের বাসাটি ছিল দারুণ সুন্দর, বাড়ির ভেতরে খালি জায়গায় বড় বড় পাথর। তার পাশে ছবির মতো সুন্দর গাছ দিয়ে সাজানো বাগান।
লোকটি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, বাংলাদেশ থেকে এসেছেন।

বুড়িমা (শাশুড়ি) বাংলাদেশ চিনলো না দেখে ওরাতা সান বললেন, *হিগাসি ইন্দো* (পূর্ব ইনডিয়া)। কষ্ট পেলাম। লাখ লাখ বীরের ত্যাগের এই দেশ, কতো কষ্টের স্বাধীনতা, তবু পরিচিত হলাম *হিগাসি ইন্দো* বলে!

বুড়িমা মনের আনন্দে কতো কথাই জিজ্ঞাসা করলেন। কিছুই বুঝলাম না। ভাষা জানি না তখন। পরবর্তীকালে এই বুড়িমার সঙ্গে আমার হয়েছিল গভীর সম্পর্ক। একটা সময় যখন বুড়িমার সঙ্গে আমার ভাষার পার্থক্য ঘুচে গিয়েছিল, তার মাঝে পেয়েছিলাম বাংলাদেশের হাজারও বুড়িমা, দাদিকে–নানিকে। তিনি আমাকে একটি কাঠের তৈরি বাটিতে কয়েকটি *ওছেমবে* (ভাতের সঙ্গে সয়া দিয়ে তৈরি বিস্কিট) দিলেন। স্বাদ তেতো। সঙ্গে আকারে ছোট, একটু লম্বাটে ওছেমবে। তবে নড়ি (সমুদ্রের শ্যাওলা দিয়ে তৈরি) দিয়ে জড়ানো। স্বাদ তেতো। কিন্তু একটু গন্ধযুদ্ধ। একটি চিনা মাটির মগে চা।

তার অনুরোধে একটি ওছেমবে তুলে মুখে দিলাম। মুহূর্তেই পৃথিবীটা কঠিন মনে হলো। চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে মগটি তুলে মুখে দিলাম। কিন্তু তীব্র বিস্ময়। পানীয়টি ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, দুর্গন্ধযুক্ত এবং স্বাদ তেতো। মুখের পানীয়টুকু কিভাবে যেন গিলে ফেলে হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে ফেলেছিলাম যাতে গলা দিয়ে বেরিয়ে না আসে।

আমার অবস্থাটা দেখে বুড়িমা বললেন, এটা *মুগি চা,* শরীরের জন্য খুবই উপকারী। এটা শরীরের আর্দ্রতা রক্ষা করে, সঙ্গে তীব্র গরমে পিপাসা নিয়ন্ত্রণ করে। গরমের দিনে শিশু থেকে বৃদ্ধরা প্রচুর ঠাণ্ডা মুগি চা পান করে। এমনকি গরমের দিনে বাচ্চারা স্কুলের টিফিনে বাধ্যতামূলকভাবে পান করে এবং পিকনিকে যেতে হলে সঙ্গে মুগি চা থাকবেই।

পরে শুনেছিলাম শিশুরা যদি পিকনিকে বেশি ছোটাছুটি করে কোলা জাতীয় পানীয় পান করে তাহলে তার মিষ্টতায় গলা বার বার শুকিয়ে আসে। ফলে শিশুরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই প্রয়োজন মুগি চা।

হঠাৎ মনে হলো, এ স্বাদ অনেক আগে একবার ছোটবেলায় পেয়েছিলাম। দাদা হুক্কা টানতেন। বাড়ির গৃহকর্মী নওশের হুক্কা ধরিয়ে প্রথমে একটু ধোয়া বের করে দাদার হাতে দিতো। আমার দাদা দারুণ রাজকীয়ভাবে ঠোট নাড়িয়ে ধোয়া ছাড়তেন। নিজ হাতে দাদাকে তেমন হুক্কা ধরাতে দেখিনি। দাদা মাঝে মধ্যে দাদিকে বলতেন ধোয়া বের করে দিতে।

আমরা অনেকগুলো ভাইবোন ছিলাম বলে দাদা, দাদি তাদের রোমান্স প্রকাশ করতে তেমন পারতেন না। দাদা কখনো দাদির নাম ধরে ডেকেছেন বলে শুনিনি। তবে হুক্কার পিপাসা পেলেই দাদা মাঝে মধ্যে ছড়ার সুরে ডাকতেন,

গুরি গুরি হুক্কা
নইসা (নওশের) টান
ছরতন (দাদির নাম) বিবি
আগুন আন রে আন।

বিষয়টা আমার কাছে এখনো দারুণ রোমান্টিক স্মৃতি।

একদিন সবার অলক্ষ্যে দাদার সদ্য পান করা হুক্কায় টান দিয়েছিলাম কৌতূহলে। হঠাৎ প্রচণ্ড কাশিতে দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। মুখ ভরে উঠেছিল তামাকের দুর্গন্ধে। জাপানিজ বুড়িমার মুগি চা–তে ছোটবেলার দাদার হুক্কার স্বাদটা পেয়েছিলাম। যদিও পরবর্তীকালে বুড়িমার আদর করে দেয়া মুগি চা–টা ঠিক মতো রসিয়ে পান করতে না পারার জন্য অপরাধ বোধ করেছি। কারণ একটা সময় এই মুগি চা, *ওচা* (গৃন টি) এবং ওছেমবে আমার অত্যন্ত প্রিয় একটি পানীয় ও খাদ্য হয়েছে। বাংলাদেশের এই গরমে মুগি চায়ে অভাব বোধ করি খুব।

চা পান নিয়ে আরো একটি বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্পর্কে না লিখে পারছি না। জাপানিজ ভাষা শিক্ষার স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য আমারও একজন স্থানীয় অভিভাবকের প্রয়োজন পড়লো। মানব অধিকার কর্মী মি. ইউশোনারির মাধ্যমে পেয়েও গেলাম একজনকে।

ভদ্রলোক জাপান রেলওয়েতে চাকরি করেন। তার পারিবারিক নামটা ভুলে গিয়েছি। ডাক নাম *মাসুমি*। ফোনে কথা বলে ঠিক হলো আমরা পর দিন টোকিওর সিনজুকু (পৃথিবীর বড় রেলস্টেশনগুলোর একটি) রেলস্টেশনে সকাল সোয়া আটটায় পরস্পর পরিচিত হবো।

স্টেশনের পশ্চিম পাশে পুলিশ বক্সের পাশেই কফি শপের সামনে নির্দিষ্ট জায়গায় আটটার আগেই অপেক্ষা করলাম স্বামী টিপুসহ। মি. ইউশোনারি আগেই বলে দিয়েছিলেন, তোমরাই তাকে কফি শপে নিয়ে আপ্যায়ন করে কৃতজ্ঞতা জানাবে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই মাসুমি সান এলেন। গায়ে রেলওয়ের উর্দি। আমরাও বিদেশি, কাজেই পরস্পরকে চিনতে কষ্ট হলো না।

পরিচয়পর্ব শেষে আমরা আমন্ত্রণ জানানোর আগেই তিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন কফি শপে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে। আমরা তার ব্যবহারে মুগ্ধ। মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানালাম।

টিপু তাকে বললো, তুমি কি খাবে বলো।

সে বললেন, আমি শুধু চা-ই খাবো। তোমরা কি খাবে বলো।

আমরা যদিও তার সঙ্গে সকালবেলার নাশতা খাবো বলে ঠিক করে এসেছিলাম তবুও তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললাম, আমরাও শুধু চা খাবো। চা পানের সঙ্গে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় নানান বিষয়ে কথা হলো। ইতিমধ্যে ওয়েটার মেয়েটি বিলটা এনে মাসুমি-র হাতে দিল।

টিপু হাত বাড়িয়ে বিল চাইলো। বললো, বিলটা আমরা শোধ করবো।

মাসুমি মাথা নেড়ে নিষেধ করলেন।

আমরা তার ব্যবহারে দারুণ খুশি। বললেন, তোমরা যাও আমি আসছি।

আমরা উঠেই দরজার বাইরে তার জন্য অপেক্ষা করলাম বিদায় নেবো বলে। হঠাৎ দেখলাম ওয়েটার মেয়েটিকে মাসুমি নিয়ে আসছে, ব্যস্তভাবে। টিপুকে বললেন, তোমরা তোমাদের চায়ের বিল শোধ করোনি?

ঘটনাটি বুঝতে আমাদের সময় লাগলো। আমরা বিমূঢ়।

বললেন আমি আমার বিল পরিশোধ করেছি, তোমরা তোমাদের বিল শোধ করো। পরে আবার দেখা হবে বলে দ্রুতই চলে গেলেন।

আমরা অপেক্ষারত মেয়েটিকে সরি বলে বিলটা শোধ করলাম।

ঘটনা প্রবাহে বিব্রত ও লজ্জিত আমরা। কফি শপ থেকে বেরিয়ে শব্দহীনভাবে হাটতে লাগলাম। সিনজুকু স্টেশনের পাশ দিয়ে বাসস্টপেজের দিকে চললাম। কিছু দূর এসেই সিনজুকু-র বিরামহীন চলন্ত রেলগাড়ির শব্দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেদের বিব্রত ভাব কাটিয়ে দিতে সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠলাম –

দে মা তোর চরণখানি

দে মা ...

গৃন রোড, ঢাকা থেকে

মিষ্টি

– রীনা

চা বিশেষ সংখ্যা আমাকে মনে করিয়ে দিল মানুষটিকে আর তার অদ্ভুত চা খাবার অভ্যাসটির কথা। সকালে তার এক মগ চা লাগতো। এক মগ টি ছিল পাচশ মিলির মতো। এটা ভর্তি করে চা দিতে হতো তাকে সকালে। এই মগের এক–তৃতীয়াংশ থাকতো চিনি। প্রচুর মিষ্টি খেতো চায়ে।

চিনি কম খেতে বললে বলতো, বাবা–মা দুজনেরই ডায়াবেটিস আছে, কাজেই তারও হবে। হওয়ার আগে যতোদিন খাওয়া যায় খেয়ে নিচ্ছে।

এই এক মগ চায়ের সঙ্গে সিগারেট দিয়ে শুরু হতো তার দিন। এ চা কখনোই সকালে শেষ হতো না। বাইরে বের হওয়ার আগে বলে যেতো, তার চা যেন রেফ্রিজারেটরে রাখা হয়। সে যখন ফিরবে তখন খাবে। ফিরে সেই রেফ্রিজারেটরের চা–টার আবার খোজ হতো। যদি কোনো দিন বুয়া ভুল করে ফেলে দিতো চা তাহলে সে এক কাণ্ড হতো বাসায়।

মাঝে মধ্যে তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, কেমন করে সে এই ঠাণ্ডা খায় আর কি মজা পায়।

হেসে বলতো এ তুমি বুঝবে না।

আসলেই তার সেই মজা পাওয়াটা কখনো বুঝিনি বা বোঝার চেষ্টা করিনি। আর এখন তো সে নেই–ই। চলে গেছে অন্য জগতে।

এই মালয়শিয়া এসে দেখলাম এরাও এক মগ চা খায় এবং সেই চায়ে চিনি থাকে না। থাকে কনডেন্সড মিল্ক। এটা দিয়েই এদের চা মিষ্টি হয়, প্রখর মিষ্টি। এরা নানান ধরনের চা খায় যেমন Teh susu (দুধ চা), Teh tarikh (টানা চা, যা বানানোর বিশেষ পদ্ধতি আছে), Teh panas (গরম লিকার, চিনি দিয়ে) Teh kosong (গরম লিকার, দুধ–চিনি ছাড়া) আর Teh ais (লিকার চা, বরফ ও চিনি) এবং আরো দুই এক রকম থাকতে পারে আমার জানার বাইরে।

যারা ভবিষ্যতে মালয়শিয়া ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য বলছি, যদি চায়ে মিষ্টি বেশি খান তাহলে Teh susu আপনার জন্য ঠিক আছে, যদি কম মিষ্টি খান তাহলে ভুলেও চায়ের কাপে চামচ দিয়ে বেশি নাড়াবেন না। তাহলে মিষ্টিতে আপনার চা খাওয়া নষ্ট হয়ে যাবে।

এখন জীবনে যেটা মিস করছি, সকালে কখনো আর কোনোদিন প্রিয়জন পাশে এসে বলে না, এই তোমার চা।

মালয়শিয়া থেকে

বিথী

২০০২ সাল। ইয়ার চেঞ্জ পরীক্ষার পরে ক্যান্টিনে খেয়ে রুমে গেলাম। শেষ বিকেলে সাথীআপাদের বাড়িতে গেলাম গল্প করার জন্য।

কলেজে ভর্তির আগে সাথীআপাদের চিনতাম না, জানতাম না। আমার বড় খালুর ফুপাতো ভাই সাথীআপার আব্বা। সেই সূত্রে পরিচয় হয় তাদের সঙ্গে। কারণ হস্টেলে থাকি, কখন কি সুবিধা–অসুবিধা হয়!

সাথীআপারা চার বোন। তিনি আমার এক ব্যাচ উপরে। সাথীআপার বড় এক বোন লতা। ছোট বোন বীথি। সে ক্লাস এইটে পড়ে। তার ছোট লামিয়া চার বছর বয়স। একটি ছেলের আশায় চারটি মেয়ে, তারপর খালাম্মা আবার প্রেগনান্ট হয়েছেন।

লতাআপা বড় থাকলেও সাথীআপা বেশি পরিচিত। কারণ সাথীআপা যেমন সুন্দরী তেমনি মেধাবী। আমাদের উপরের দুই ব্যাচ থেকে আমরা পর্যন্ত সবাই সাথীআপার গুণকীর্তনে মত্ত থাকি। সেই কারণে সবাই

সাথীদের বাড়ি বলে তাদের বাড়িকে চেনে। তাই সাথীআপাদের আত্মীয় বলে হস্টেলে আমার কদর বেড়ে যায়।

সাথীআপার অনেক ক্লাসমেট তাদের বাড়ি যায়। তাদের সবার ব্যবহার খুবই ভালো। ফলে এই ফ্যামিলির একটি গুডউইল এই জোনে বিস্তৃত। সেই জন্যই আমারও তাদের বাড়িতে কারণে-অকারণে যাওয়া-আসা। অন্য একটি কারণও আছে। সেটি হচ্ছে ক্লাস এইটে পড়া, নাচ, গানের স্কুলে ভর্তি হওয়া বিথী। গত এক বছরে তার নজরে পড়া শুরু করেছি।

তাই সেদিন পরীক্ষার শেষ দিন বিকেলে বিথীকে দেখার আশায় গেলাম সাথীআপাদের বাড়িতে। কিন্তু সেদিনই ঘটলো এক লজ্জাজনক ঘটনা।

আড্ডা দিচ্ছিলাম সাথীআপা, খালাম্মার সঙ্গে আর পাশের রুমে বিথী কিছু একটা পড়ছে বা পড়ার ভান করছে।

কিছুক্ষণ পর কাজের মেয়ে চা-বিস্কিট নিয়ে এলো।

তাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়ে নিলাম চায়ের কাপ। কিন্তু একি, চায়ে পোড়া গন্ধ কিসের! একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকলাম। কিন্তু ওনারা নিঃসঙ্কোচে খেয়ে চলেছেন।

বলে ফেললাম হঠাৎ করে, আপা, চায়ে পোড়া পোড়া গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে যে।

ওনারা আমার কথা শুনে হেসে খুন।

দেখলাম বিথীও মুচকি হেসে দরজায় ঢু মেরে চলে গেল।

খালাম্মা বললেন, এটা চা না, এটা কফি।

লজ্জিত হয়ে পড়লাম। আনইজি ফিল করছিলাম। সেদিন আর বেশিক্ষণ দেরি করিনি তাদের বাসায়।

পরদিন গেলাম। বিথী এবং খালাম্মা ছাড়া সবাই বেড়াতে গেছে। আড্ডা দেয়ার মতো রইলো বিথী আর সঙ্গে দুই কাপ কফি।

বিথীর সঙ্গে আগে দুই একটি কথা হলেও সেদিনই প্রথম আড্ডা এবং তার প্রেমের অফার।

হস্টেলে এসে বন্ধুদের আগের দিনের ও আজকের ঘটনা বলতেই বললো, তুই কালকের কফিকে চা বলাতেই তোর এ সাফল্য। কারণ বিথী হয়তো ভেবে নিয়েছে, তোকে ইচ্ছামতো খেলানো যাবে। কারণ তুই মেধাবী হলেও বোকা।

বিথীর সঙ্গেও পরে এই নিয়ে অনেক হাসাহাসি হয়েছে।

আরেকদিন যখন সে নাচের ক্লাস আর আমি প্র্যাকটিকাল ক্লাস বাদ দিয়ে একাকী স্বর্গ রচনায় ব্যস্ত তখন বললো, জানো, তোমাকে আমার প্রথম দেখাতেই ভালো লেগেছিল। কিন্তু বলতে পারিনি। কিন্তু সেই চা-কফির ঘটনার রাতে অনেক রাত ভেবে পরের দিন তোমায় অফার করি। যদিও বুঝতাম তুমি আমায় চাও তবুও ভয় ছিল যদি না করো! ভাবলাম, এখন তোমায় বললে, আমার গ্রহণ না করলেও, অপমান তো করতে পারবে না!

মনে মনে ভাবলাম, বিথীর বয়সে আমার কি এতো বোঝার ক্ষমতা ছিল! কেন জানি বিথীর সঙ্গে প্রেম আমার এগুলো না। কোথায় যেন বাধা ছিল।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর আর তাদের বাসায় বা সাথীআপা অথবা বিথী কারো সঙ্গে দেখা হয়নি। শুনেছিলাম পরের সন্তানটিও মেয়ে হয়েছিল। রেজাল্ট আনার সময়ও তাদেরকে পাস করার খবরটা দেয়ার প্রয়োজন মনে করিনি।

নাম বিহীন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ থেকে

সেরা চা

– জামান

আমার ছোট বোন ইংল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে এসেছে। দিন ছিল ২৪ মার্চ ২০০২ সাল।

ওই দিন ওর শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম, বিদায় জানাতে। কারণ ২৬ তারিখ ফিরে যাবে। আমি যখন ওর দেবর-ননদের সঙ্গে গল্প করছিলাম, আমার বোন একটা ট্রে-তে করে সবার জন্য নিজ হাতে তৈরি চা নিয়ে হাজির।

একটা কাপ বাদে সবগুলো কাপই এক ধরনের। সবার আগে ও ওই আলাদা কাপই আমাকে দিয়েছিল।

ওই চা-ই ছিল আমার জীবনের সেরা চা। কারণ ওই চায়ে ছিল বড় ভাইয়ের প্রতি ছোট বোনের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পরশ।

দোয়া করি, আমার বোন যেন আজীবন সুখী হয়।

zaman_s2003@yahoo.com

কথকতা

– আশরাফুল হক

আমার স্বল্প জানায় আমাদের জাতীয় কবি নজরুলের মতো চাখোর অল্পই ছিলেন। চা ও নজরুলকে ঘিরে কয়েকটি গল্প বা গল্পাংশ এখানে তুলে ধরছি।

কলকাতা থেকে নজরুল এসেছেন ফরিদপুরে কবি জসীম-উদদীনের বাড়িতে সেই ত্রিশের দশকে। বিকেল হতেই চা চেয়ে বসলেন।

পল্লী কবির তো মাথায় হাত। চা? এই গণ্ড গ্রামে চা কোথায়! কিন্তু বিদ্রোহী কবির আবদার না মেটালে তো গ্রামের ইজ্জত থাকে না। কাজেই খোজ-খোজ. এখানে-সেখানে, পাড়ায়-পাড়ায়, বাড়িতে-বাড়িতে।

হ্যা, অবশেষে দুই ক্রোশ দূরে কলকাতা ফেরত এক মাতব্বরের বাড়িতে চা পাতার সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি কিছু চা পাতা শখ করে এনেছিলেন বছর কয়েক আগে। পরিমাণ ঠিক রাখতে তার সঙ্গে চুপি চুপি যোগ করেছেন অন্য পাতার চূর্ণও।

যাক, সেই সংগ্রহ থেকে কিছু চা পাতা আনা গেল। কিন্তু বাহক বাহুল্য মনে করে মাতব্বর বাড়ি থেকে রন্ধন প্রণালী জেনে আসেননি।

এবার উপায়? পাচ বাড়ির রন্ধন পটিয়সীরা বিস্তর গবেষণা করে চা রান্না করে এক বিশাল হাড়িতে করে তা নজরুলের সামনে পরিবেশন করলেন। চা পানের মহাযজ্ঞ দেখেই নজরুলের চোখ ছানাবড়া। আর রস আস্বাদনে তিনি হলেন বজ্রাহত।

কি নেই চা-তে? হরেক রকম মশলার মিশ্রণ, কুচি কুচি সবজি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডিত মাছ ইত্যাদি। এতো চা পান নয়, চা ভোজের সমারোহ। এরপর যে কয়েকদিন ওই গায়ে ছিলেন নজরুল ভুলেও চায়ের নাম উচ্চারণ করেননি বলে আমার অনুমান।

তবে দেরিতে চা পরিবেশিত হওয়া একটি অসাধারণ নজরুল গীতির জন্ম হয়েছে। *এতো জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনল বল কে?* এই গানের আদি রূপ হলো এতো পরে এক কাপ চা আনলো বলো কে?

এরপর জানাই চাকর শব্দের উৎপত্তি নিয়ে নজরুলের গবেষণা। তার মতে, খানসামা হলো চাকর শব্দের আসল রূপ। তাকে বার বার চা করো, চা করো হুকুম দিতে গিয়ে খানসামা শব্দ পাল্টে চাকর রূপ নিয়েছে। বাঃ বাঃ।

সিলেটবাসীদের জন্য আছে নজরুলের বিরাট বড় সার্টিফিকেট। নজরুল বলে গেছেন, সিলেটবাসী মানেই চালাক। কারণ তারা যে সহজেই লাখ কাপ চা খায়। ফলে চালাক না হয়ে যায় কোথায়?

চা বাগানে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় অমর সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। চা বাগানে চাকরিরত এক বন্ধুর বাড়িতে অতিথি হয়েছেন তিনি। অমন বিখ্যাত ব্যক্তিকে পেয়ে পরিচয় করিয়ে দিতে নিয়ে গেছেন বাগানের কর্তাব্যক্তিদের কাছে। বড় মুখ করে বললেন, বন্ধু আমার লেখক।

কর্মকর্তা শুনে বললেন, লেখক? তা কোন বাগানের।

তারাশংকর মহাশয়ের বন্ধুর অবস্থা তখন *ছেড়ে দে মা কেঁদে বাচি*। চা বাগানে সদ্য চাকরিতে আসা ওই বন্ধুর খেয়াল ছিল না, প্রত্যেক চা বাগানে *লেখক* নামে কনিষ্ঠ কেরানি পদ আছে যার কাজ হিসাবরক্ষণের।

হায় লেখক, হায় তারাশংকর আর হায় বাংলা সাহিত্য!

চা নিয়ে নিশ্চয় অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা আছে। তবে আমি জানি শুধু একটি। বস্টন চা খাওয়া হলো সেই ঘটনা। বৃটিশদের স্বাধীনতা অর্জনে আমেরিকানদের জন্য এক মাইলফলক। আমেরিকানরা দাবি করে আসছিল, তাদের প্রতিনিধির উপস্থিতি ছাড়া বৃটিশ পার্লামেন্টে আমেরিকানদের উপর কর বসাতে পারবে না। সেই গণদাবির তোয়াক্কা না করে বৃটিশ পার্লামেন্ট আমেরিকানদের ওপর চা আমদানির কর বসিয়ে দিল। আর যায় কোথায়!

বস্টন বন্দরে যখন চায়ের চালান নিয়ে জাহাজ এলো, ক্ষিপ্ত আমেরিকানরা সমস্ত চায়ের পেটিকা সমুদ্রে ফেলে দিল। *কর দেবো না, চাও খাবো না।* এটাই হলো বস্টন চা খাওয়া যার প্রভাবে আমেরিকানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম জোরদার হয়েছিল।

চা নিয়ে নাকাল হওয়ার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে লেখাটা শেষ করছি। ১৯৭২ সালে সবান্ধবেই গিয়েছিলাম সিলেটে আন্তর্জাতিক সেবা সংগঠন এপেক্স ইন্টারন্যাশনাল-এর এক সাধারণ সভায় যোগ দিতে। ফিরতি ট্রেন ধরলাম রাত আটটার দিকে। ট্রেন ছাড়ার মিনিট দশেক আগে বিনয়ের অবতার দুই মূর্তি হাজির কয়েকটি চায়ের প্যাকেট হাতে। বক্তব্য হলো, তারা চা বাগানের ক্ষুদ্র কর্মচারি। মজুরির বাড়তি বাগান থেকে অতি উত্তম চা পাতা পেয়ে থাকে শুধু নিজেদের জন্য। টাকার প্রয়োজনে গোপনে বিক্রয় করতে এসেছে বাজার দামের অর্ধেক দামে।

উত্তম মওকা মনে করে আটটি প্যাকেটই ভাগাভাগি করে কিনে নিলাম। স্ব স্ব বাসায় পরের ফলাফল অভিন্ন। গিন্নিদের ঝংকার এই বিস্বাদ পাতা ফু দিলেও যে নেয় সে কেবলমাত্র রজক পালিত প্রাণী হতে পারে, মানুষ তো নয়ই।

নয়া পল্টন, ঢাকা থেকে

রাশিয়ায় চায়নায়

– শহীদুল ইসলাম

ছাত্র অবস্থায় আমাকে ইউক্রেইন-এ থাকতে হয়েছিল। আমি দেখেছি সেখানে সবাই খাবার সময় ও পরে বড় বড় মগে করে চা পান করে থাকে। আমরা যেমন সাধারণত পানি পান করে থাকি, তারা চা পান করে অথবা শুকনো ফলের সেদ্ধ করা *কম্প* পান করে।

ইউক্রেইনের রাজধানী কিয়েভ-এ সবচেয়ে পুরনো যে বাংলাদেশি ছিলেন তিনি প্রয়াত রমা দত্ত। তিনি আমাকে একটি ইনডিয়ান কম্পানিতে পার্ট টাইম চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। কম্পানিটি তারই বন্ধুর যিনি কিছুদিন আগে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। গর্বাচেভের *প্রেসতরইকার* কল্যাণে সাধু-অসাধু ব্যবসায়ে দ্রুত যারা বড়লোক হয়েছেন তিনি তাদের একজন।

আমাদের হেড অফিস ছিল কলকাতায়। যখন আমাদের কম্পানির লোকজন কিয়েভ আসতো অনেকটা দোভাষীর কাজ করতাম, তারা কেউ না থাকলে তাদের প্রতিনিধি হয়ে তাদের দেয়া কাজগুলো করে দিতাম।

আমাদের দেশের সরকারি গোডাউনে যেমন খাদ্যশস্য সরকার ক্রয় করে সংগ্রহ করে রাখে ঠিক তেমনি ইউক্রেইনে সরকারকে পানীয় হিসেবে চায়ের সংগ্রহ রাখতে হয়।

এ রকম একটি সরকারি অর্ডার আমাদের কম্পানি পায় প্রতি মাসে ছয়টি চল্লিশ ফিট কন্টেইনার। এক বছরের জন্যে বাহাত্তর কনটেইনার চা আমাদের দিতে হয়েছিল। এই অর্ডারটা পাওয়ার জন্য অনেক কাঠ–কয়লা খরচ করতে হয়েছে। বড় ধরনের একটা অংক তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রীকেও দিতে হয়েছে।

আমরা আসলে মনে করি, আমাদের দেশের চা খুবই মানসম্পন্ন। তা ঠিক নয়। চায়ের হিসেবে *অর্থডক্স* পাতা চা সবচেয়ে দামি ও ভালো। গ্র্যানুইলার গুটি চা একটি মিশ্রণ, এর দামও কম, এটাকে সিটিসি বলে। অথচ আমাদের দেশে অর্থডক্স হয় না বললেই চলে।

চায়নাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম ২০০০ সালে। ওখানে দেখেছি ছোট–বড় সব ধরনের রেস্তোরা, ক্যাফেতে চা ফৃ। তবে চিনি ছাড়া সবুজ জেসমিন চা–ই বেশি। পানির বদলে এরাও খুব চা পান করে।

২৫ ইউএসডি দিয়ে একদিনের বেইজিং ঘুরে দেখার ট্যুর টিকেট কিনে যখন অনেক ঘুরে চায়নার প্রাচীর দেখা শেষ করে আমাদের চা পানের বিরতিতে চায়নার ঐতিহ্যবাহী চা পান করা দেখতে লাগলাম সেই ঐতিহ্য রীতিতে আমরাও চা পানে অংশ নিলাম। অর্ধেক ডিমের খোসার মতো চায়ের কাপে কতো ধরনের, কতো স্বাদের চা ঘুরে ঘুরে এলো। চায়নাতে চা পানের এই ঐতিহ্যবাহী প্রক্রিয়া সত্যি মনে রাখার মতো।

ইটালি থেকে
shakhidul@yahoo.com

টি পার্টি

কিছুদিন আগের ঘটনা। সকালবেলা নাশতা করেই ভো দৌড় কলেজে। ক্লাস শেষে দোকানে এলাম। পড়ার পাশাপাশি একটা দোকানে পার্ট টাইম চাকরি করি। দুপুর তিনটায় দোকানে এসে সহকর্মীকে ছুটি দিলাম। সে সকাল শিফটে কাজ করে আর আমি বিকেল শিফটে।

যেই ক্যাশ বুঝে নিয়ে পিচ্চিকে ডেকে চা আনতে পাঠাবো তখনই প্রবেশ দুজন বিদেশি মানুষের। একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। কাউন্টারের সামনে এসে দুজনেই হেসে হাই বলে হাত বাড়ালেন হ্যান্ডশেক করতে। করলাম এবং সিট ডাউন প্লিজ বলে বসতে দিলাম।

মহিলা তখন বললেন, সুন্দর দোকান তোমাদের। এটা কি তোমার বিজনেস?

ওনার স্পষ্ট বাংলায় অভিভূত হলাম। বললাম, না, আমি এখানে পার্ট টাইম জব করি। মূলত আমি ছাত্র।

পিচ্চি তখন কাউন্টারের পাশে এসে বললো, চা আনতে যাই?

একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে বললাম, তিন কাপ নিয়ে আয়।

মহিলা তখন জিজ্ঞাসা করলেন, চা মিনস টি?

বললাম, হ্যা।

তিনি বললেন, আমিও খাবো। এবং বিলটা আমি দেবো।

ওনার সঙ্গের ভদ্রলোক হাসছেন।

বললাম, অবশ্যই আপনারা খাবেন। তবে বিলটা আমি দিয়ে ফেলেছি, আপনার দিতে হবে না।

তিনি বাধা দিয়ে বললেন, না, তুমি ছাত্র, তোমার স্বল্প আয়, তুমি কেন দেবে?

ওনাকে বুঝিয়ে বললাম, এই চায়ের বিল আমার দোকান থেকে দেয়া হবে। আর আপনারা আমার কাস্টমার। তাই বিলটা আপনার কাছ থেকে নেয়া যাবে না।

তিনি তখন বললেন, ঠিক আছে, তুমি যদি আমার তরফ থেকে চা খাও, মানে আমার বাসায় চায়ের নিমন্ত্রণ কবুল করো তাহলে আমি চা খেতে পারি।

বললাম, আচ্ছা খাবো। কিন্তু আপনার বাসা তো চিনি না।

তিনি বাসার ঠিকানা দিলেন।

আমরা একই এলাকার বাসিন্দা। ওনাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানতে পারলাম, ওনার স্বামী বাংলাদেশি। জন্ম কানাডাতে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ওনারা বাংলাদেশে এসেছেন।

তিনি ইটালিয়ান। ছোটবেলা থেকেই বাঙালিদের সঙ্গে মিশতে মিশতে বাংলা শিখে ফেলেছেন। বিয়ে হয়েছে মাত্র সাত মাস।

পিচ্চি চা দিলে সবাই চা খেলাম।

ওনারা বেশ কিছু জিন্স, টি–শার্ট, পারফিউম ও কসমেটিকস কিনে নিলেন। যাবার সময় জিজ্ঞাসা করলেন কখন যাবো তার বাসায় চা খেতে?

বললাম, নেকস্ট ফ্রাইডে বিকেলে।

ওনারা চলে গেলেন।

বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে দোকানে আমার ফোন এলো। অবাক হলাম, কে করলো? আমি তখন কাউন্টারের বাইরে। সবাই তো আমার মোবাইলে রিং করে। দোকানের নাম্বার তো কাউকে দিইনি। এসব ভাবতে ভাবতে ফোন ধরি।

ওপাশ থেকে ভেসে এলো Hi... how are you?

বললাম, Fine, how are you all?

চিনে গেলাম কে ফোন করেছেন। তিনি মনে করিয়ে দিলেন আগামীকাল যেন ওনার টি–পার্টিতে যেতে ভুলে না যাই।

বললাম, যাবো।

প্রতি শুক্রবার জুমা শেষে ঘণ্টা খানেক আড্ডা দিই সব বন্ধু মিলে। আড্ডা দিতে দিতে তিনটা বেজে গেছে। ছুটে যাই বাসায়। খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিই। পাচটার সময় তৈরি হয়ে বের হই একগুচ্ছ রজনীগন্ধার মাঝে টকটকে লাল চারটা গোলাপ ফুল গুজে নিয়ে গেলাম তাকে দেবো বলে।

দরজা খুলেই তিনি আমাকে দেখে হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন আছো?

বললাম ভালো, ফুলটা বাড়িয়ে দিতেই ওনার হাসি আরো প্রশস্ত হলো। আমায় জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়ে বললেন, সো নাইস।

ওনাদের ড্রয়িংরুমে বসালেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, স্বামী কোথায়?

বললেন, এক বন্ধুর সঙ্গে লং ড্রাইভে গেছে। আমি আসবো বলে তিনি যাননি।

স্বামী–স্ত্রী দুজন ছাড়া এখানে আর কেউ থাকে না। একটু দূরে ওনার স্বামীর আত্মীয়ের বাড়ি। কিছুক্ষণ এটা–সেটা নিয়ে গল্প করতে করতে চা ও চকলেট, কেক খেলাম। ততোক্ষণে আমরা পরস্পরই তুমিতে নেমে গেছি।

সে তখন জিজ্ঞাসা করলো গার্ল ফ্রেন্ড আছে কি না?

বললাম, না।

সে প্রস্তাব করলো তার বন্ধু হতে।

বললাম, বন্ধু হতে তো আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার যে স্বামী আছে?

সে আমার পাশে বসে বললো, স্বামীর বান্ধবীটি আছে। সে কিছু বলে না। তাই আমারও বন্ধু থাকলে স্বামী কিছু বলবে না।

বললাম, তবে বন্ধু হতে আপত্তি নেই।

সে আমার হাতটা তার হাতে নিয়ে বললো, থ্যাংকস ডিয়ার ফ্রেন্ড। বলেই আমার ঠোটটাতে তার ঠোট রাখলো।

দুজনার ঠোট কতোক্ষণ যে পরস্পরের সঙ্গে মিশে রইলো জানি না।

এক সময় তার বুকে হাত রাখলাম। টি-শার্টের ভেতরে ব্রাহীন কোমল স্তন জোড়ায় হালকা চাপ দিতে ভালোই লাগছিল। এক সময় সে যেন বেপরোয়া হয়ে উঠলো। আমার শার্টের বোতাম খুলে আমার বুকে মুখ গুজল। আমিও তার টি-শার্ট খুলে উন্মুক্ত স্তনে হাত, মুখ সমানে চালিয়ে গেলাম। হারিয়ে গেলাম দুজনে অন্য এক ভুবনে।

সে আমায় নিয়ে একটা চায়নিজ রেস্টুরেন্টে গেল। রাতে দুজনে এক সঙ্গে খেয়ে-দেয়ে তাকে তার বাসায় দিয়ে এলাম। দুই মাস তারা ছিল বাংলাদেশে। প্রায় সময়ই সকাল বা বিকেলে, কখনো বা রাতে চা খেতে যেতাম তার বাসায়।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

অপূর্ণ সাধ

– ক্ষমা চৌধুরী

চা খাই না বলেও আমাকে উপহাস করে। জানি না কেন। তবে ও চা খুব পছন্দ করে। প্রতিদিন অন্তত চার কাপ ওর চা-ই চাই। অবশ্য সেটা হোটেলের এবং কড়া চিনি দিয়ে। কখনো আমার সঙ্গে দেখা হলে আমার কাছে তৈরি করে নিতো এবং আমাকে খেতে বলতো, সেটা চিনি ছাড়া। আমাকে খেতে বলতো আর বলতো আমি খেলে নাকি ওর চায়ে আর চিনি লাগে না। জানি না কেন, বলতো ঝুটা খেলে নাকি ভালোবাসা বাড়ে। শুনে হাসতাম। কিন্তু আমাকে কখনো ওর চা খাওয়াতে পারেনি।

একদিন হঠাৎ বলে, জানিস, আমি খুব সুন্দর চা বানাতে পারি। আমার চা খেলে পাগল হয়ে যাবি।

বলি, পাগল হলে আমার পৃথিবী শেষ। তাই খেতেও চাই না।

কেন জানি না চা বানিয়ে আমাকে খাওয়াতে চাইতো। আমি ইচ্ছা করেই খেতাম না, জোর করলেও না।

হঠাৎ এক রাতে, গভীর রাতে সে চা বানিয়ে বাসার সবাইকে ঘুম থেকে তুলে খাইয়েছে কিন্তু সেদিন আমি ছিলাম না। তাই ওর তৈরি চা আমার আর খাওয়া হয়নি।

পরদিন সন্ধ্যায় আকস্মিকভাবে জানতে পারি, সে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। চিরদিনের জন্য। আমি স্তব্ধ, বাকরুদ্ধ।

ওর খুব সাধ ছিল ওর তৈরি চা আমাকে খাওয়াবে। আমার আর ওর তৈরি চা খাওয়া হলো না। ওর চা খেয়ে পাগল হওয়াও হলো না।

আজ অবেহলায় সব হারিয়ে মনে হয় ওর চা-টা খেলে তো অন্তত একটা অপূর্ণতা কম হতো।

রংপুর থেকে

সমর্পিত

– সোহান

এই ছেলে, তোমার নাম কি সোহান?

জি, আপনাকে পরিচিত মনে হচ্ছে। কিন্তু মনে করতে পারছি না।

মনে করার চেষ্টা করো। পারছো না! শোনো, শাওনের কথা মনে আছে। আমি শাওনের বড় বোন মণিকা।

মনে পড়েছে। কেমন আছেন আপনি? শাওন কেমন আছে?

চলো, কোথাও বসি। সেখানেই সব জানা হবে।

চলে গেলাম ফাস্ট ফুডের দোকানে। জানতে পারলাম এই শহরে তিনি ও তার স্বামী একই অফিসে চাকরি করেন। বাসা ভাড়া করে থাকেন। শাওন রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। এটাও জানালেন, তাদের কোনো সন্তান হয়নি। বাসার ঠিকানা দিয়ে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ দিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি চলে গেলেন নিজের গন্তব্য স্থলে।

সাত দিন পর একটি কাজে মণিকাআপার অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে তিনি তার সাধ্যমতো যত্ন করলেন এবং কাজেও সহযোগিতা করলেন।

একদিন বিকেলবেলা ফোন করে বললেন, চলে এসো।

জরুরি কাজ মনে করে গেলাম মণিকাআপার অফিসে।

কিছুক্ষণ পর আমাকে নিয়ে তিনি বের হলেন। জানালেন, কাজ–কর্ম করতে আজ আর ভালো লাগছে না। তাই হই চই করবেন, যেখানে খুশি যাবেন। তারপর সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরবেন।

সেদিন তিনি প্রচণ্ড হই চই করলেন। আইসক্রিম, কফি, চটপটি ইত্যাদি খাওয়ালেন। বাসায় যাওয়ার আগে বললেন, আগামীকাল ছুটি নিয়েছি, বাসায় থাকবো, চলে এসো ঠিক দশটায়।

চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ। যেতেই হবে বলে গেলেন।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাজার সেরে সাড়ে দশটার দিকে গেলাম মণিকাআপার বাসায়।

দেখলাম গেটের কাছে তিনি দাড়ানো আছেন।

আমাকে বললেন, এতো দেরি হলো কেন?

বললাম, বাজার সেরে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল, ক্ষমা করবেন।

ঠিক আছে, ঢোকো ঘরে।

ঘরে ঢুকে দেখি সাজানো ড্রয়িংরুম। আমাকে ড্রয়িংরুমে না বসিয়ে হাত ধরে নিয়ে গেলেন রান্নাঘরে। চেয়ারে বসতে দিলেন এবং বললেন, আগে চা নাশতা খাও, তারপর অন্য কিছু খাবে। চা তৈরি করবো, তোমার সঙ্গে গল্পও করবো।

আমার ততোক্ষণে খেয়াল হলো বাসায় অন্য কোনো লোক নেই। জিজ্ঞাসা করতেই জানলাম, স্বামী একটি ট্রেনিংয়ে ছয় মাসের জন্য বিদেশে গিয়েছেন। এক ননদকে নিয়ে আপাতত তিনি এ বাসায় থাকেন। ননদ স্থানীয় এক মহিলা কলেজে পড়ে। আজ সকালবেলা ননদ গেছে গ্রামের বাড়ি, আগামীকাল চলে আসবে।

গল্প করতে করতে চা শেষ হয়ে গেল। আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন ড্রয়িংরুমে। সেখানে কম্পিউটারে সাম্প্রতিক মুক্তিপ্রাপ্ত এক বাংলা সিনেমা দেখতে বসলেন। সিনেমা দেখার সময় মাঝে মধ্যে উদ্ভট মন্তব্য করে দুজনেই প্রচুর হাসাহাসি করলাম।

এক সময় তিনি বললেন, তুমি বসো, আমি গোসল সেরে আসি। বলে তিনি চলে গেলেন বাথরুমে।

কিছুক্ষণ পর বাথরুমের দরজা সামান্য ফাক করে জানালেন, তোয়ালে ভুলে রেখে গিয়েছেন সেটা যেন দিই।

তোয়ালে নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে হাত বাড়িয়ে দিই।

আকস্মিক টান মেরে আমাকে তিনি ঢুকিয়ে ফেলেন বাথরুমের ভেতরে।

দেখি তিনি পুরো উলঙ্গ। লজ্জায় দুই চোখ ঢেকে ফেললাম। হঠাৎ করে তৃষ্ণার্ত দুটি ঠোট আমার ঠোটে পেলাম। জোর করে ছাড়িয়ে বললাম, ছিঃ মণিকাআপা। আপনাকে বড় বোনের মতো শ্রদ্ধা করি। কোনোদিনও কুনজরে দেখিনি। একি করলেন আপনি।

দুই হাত প্রসারিত করে আমাকে আটকিয়ে বললেন, তোমার দুলাভাই বিদেশে গিয়েছে আজ সাড়ে পাচ মাস। এরপর থেকে আমি ক্ষুধার্ত। তোমাকে দেখার পর পরই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তোমাকে দিয়েই মনের শান্তি ফিরিয়ে আনবো। আমি আর পারছি না।

বলেই তিনি আমার প্যান্টের চেইন ও হুক খুলে ফেলেন। প্যান্ট পড়ে যায় নিচে। পেছন দিক দিয়ে আমাকে ধরে উচু করে প্যান্ট খুলে ফেলেন। বাধা দিয়েও ফেরাতে পারিনি। এক সময় আত্মসমর্পণ করে ওনাকে পাজাকোলে করে বিছানায় নিয়ে যাই। এরপর তিনিই শিখিয়ে দেন সব কিছু।

শান্ত হওয়ার পর বুঝলাম কেন এতো অশান্ত হয়ে ছিল ওনার মন। বেশ কয়েক মিনিট শান্ত দেহ নিয়ে শুয়ে থাকি বিছানায়।

দুপুরে খাওয়ার পর বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে গল্প করার পর হঠাৎ তিনি উঠে চলে যান কম্পিউটারের কাছে এবং তারপর ফুল স্পিডে ফ্যান চালিয়ে নীল ছবি দেখতে থাকেন। দুজনেই উত্তেজিত হয়ে এক সময় শান্ত হলাম। বুঝতে পারলাম বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি নারী–পুরুষের আকাঙ্খা, শান্তি, সুখ।

পবিত্র হয়ে বসার পর মণিকাআপা বললেন, তোমার দুলাভাইয়ের যৌবনকালের কুঅভ্যাসের জন্য বিয়ের পর থেকে পুরোপুরি শান্তি পাইনি। তাই মাঝে মধ্যে জীবনটাকে মনে হতো বিষবৎ ত্যাজ্য। আজ তুমি আমাকে যে শান্তি দিলে তা আমি জীবনেও ভুলবো না। তোমার দুলাভাইকে বলে দিয়েছিলাম বিদেশে চিকিৎসা করে আসতে। সে যে রকম বৌ পাগল লোক তাতে সে চিকিৎসা করাবেই। তাই পরে আমার আর সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। আমি জানি, আজ আমরা যা করেছি তা সামাজিক, ধর্মীয় সকল দৃষ্টিতেই জঘন্য অপরাধ। আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তওবা করে নিও। আমাকে ভুল বুঝো না। ভবিষ্যতে যদি কখনো তোমাকে ডেকে পাঠাই তাহলেও তুমি এসো না। এবার যাও। বলেই তিনি আমার কোনো কথা না শুনে আমাকে বাসা থেকে বের করে দিলেন।

জানি না, মণিকাআপা এখন কেমন আছেন? সুখে থাকুন, শান্তিতে থাকুন এই কামনাই করি।

কোনো পুরুষ যদি জোর করে কোনো নারীর নারীত্ব কেড়ে নেয় তাহলে তাকে ধর্ষণ বলে। যদিও জোর করতে করতে এক সময় নারীও আত্মসমর্পণ করে। আমার ক্ষেত্রে যে ঘটনার উল্লেখ করলাম তাকে কি বলবো ...!

সানকিপাড়া, ময়মনসিংহ থেকে

ছোট বার্তা

– অণিলা

সারা রাত এবং সকাল ও দুপুর ডিউটি করে খুব টায়ার্ড ছিল। সে আমাকে ফোন করে বললো, তুমি অফিস থেকে বের হয়ে আমাকে ফোন দিও। এই ফাকে আমি একটু ঘুমাবো।

কাছাকাছি এসেই ফোন করলাম, বের হয়ে পড়ো, চলে এসেছি।

মনে হলো নিজের অজান্তেই বিরক্ত হচ্ছে। তবুও ঘুম মাখা চোখে বের হয়ে এলো।

রিকশায় বসেই বার বার চা খাওয়ার কথা বলছে। কিন্তু কেন জানি সে রকম দোকান মিলছে না। অবশেষে ইউনিভার্সিটির গেটের সামনের ইট ও বস্তা দিয়ে তৈরি ইটালি রেস্টুরেন্টে চা খেতে চাইলো। কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে

এই স্যাতস্যাতে জায়গায় নামতে আমার অসহ্য লাগছিল। তাই আমি জোরে না বললাম। সামনে আশ্বাস দিলাম ক্যান্টিনের। ইউনিভার্সিটি বন্ধ থাকায় ক্যান্টিনও বন্ধ।

বেচারার আমার ওপর রাগ।

আমারও খুব খারাপ লাগছিল। এতো সব যখন ভাবছি তখন হঠাৎ করে একটি বাচ্চা ছেলে ফ্লাস্ক হাতে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে চা বিক্রি করছে দেখে বেশ অবাক হলাম। খুব খুশি হলাম, তার চা-টা ভালো হবে।

যাই হোক, আমি ওই রঙ চা খাইনি। কারণ নিশ্চিত ছিলাম কয়েকদিন আগে আমার জন্ডিস হয়েছিল বাইরে চা, চটপটি ইত্যাদি খাওয়ায়। তাই বিপদে না পড়ে বাইরের চা খাওয়া ঠিক নয়।

সিলেট থেকে

কান্তা

– সুমন

আট নয় বছর বয়সেই শিখে নিয়েছিলাম চা তৈরি করা।

প্রথমেই চা তৈরি করে খাওয়াই মা, বাবা ও সোনার নানিকে (মায়ের খালা)।

ওনারা আমার হাতের চা খেয়ে খুব প্রশংসা করেন।

সেই থেকে চা তৈরির দায়িত্ব এসে পড়লো আমার ঘাড়ে।

অতিথি এলে মা-আপা সবাই কথা বলতেন তাদের সঙ্গে আর আমি তৈরি করতাম চা নাশতা। বেশ সুনাম অর্জন করি তাতে।

তাছাড়া চায়ের জন্য বিখ্যাত নগরী সিলেটের হওয়াতে চা ছিল আমাদের সকলেরই প্রিয় পানীয়। প্রায় চোদ্দ পনেরো বছর বয়স থেকে প্রতিদিন কম করে আট দশবার চা খাওয়া হতো। আত্মীয়স্বজন কেউ কোনো কাজ করাতে হলেও আমাকে প্রথমে ঘুষ হিসেবে চা খাওয়াতো।

তাতে খুশি মনে কাজ করে দিতাম নিখুত মনোযোগ সহকারে।

বান্ধবী কান্তা তৈরি করতো রঙ চা, শাদা কাপের মাঝে চায়ের রঙটা স্পষ্ট কমলা রঙের বোঝা যেতো। সেই চা প্রতিদিন পান করবো বলে প্রয়োজনে পায়ে হেটে হলেও পুরনো মেডিকাল থেকে যেতাম সেই গুয়াইপাড়া।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার হাতের রঙ চা খেতে খেতে আড্ডা দিতাম আট নয়টা পর্যন্ত তার বাসায়।

ফেরার পথে দরগা গেটের *ক্যাফে বাগদাদ* নামের রেস্টুরেন্টে চা খেতাম।

ফিরে আসি কান্তার কথায়। একদিন তার বাসায় গিয়ে নক করতেই দরজা খুলে দেয় প্রায় বত্রিশ চৌত্রিশ বছর বয়স্ক এক ভদ্রলোক। চশমা পরা হাই পাওয়ারের। খুব বিশ্রী চেহারার।

ভাবলাম ভুল ফ্ল্যাটে এসেছি নাকি? কেননা পিতৃহীন কান্তা, ছোট ভাই ও মা নিয়ে থাকে এই ফ্ল্যাটে। তাদের আত্মীয়স্বজন বা স্টুডিওর কর্মী সবাইকে আমি ভালোই চিনি।

ভদ্রলোক আমাকে বললেন, আপনি সুমন তো?

বললাম, হ্যা?

আরো অবাক হলাম। আমি ওনাকে চিনি না। অথচ তিনি আমার নাম জানলেন কি করে? তাও ওনার কথায় স্পষ্ট ঢাকার ভাষার টান।

তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ভেতরে আসেন। বলেই আমাকে প্রায় টেনে ভেতরে নিলেন।

দেখি মন খারাপ অবস্থায় কান্তা বসে আছে। ভদ্রলোক তখন নিজের পরিচয় দিলেন। নাম মুনির।

তখনই চিনতে পারলাম এই সেই ভদ্রলোক যে কান্তার শিক্ষক। কিন্তু বাস্তবে এক পাগল প্রেমিক। অবাক হই এই ভেবে, আমি ছেলে হয়েও যে পুরুষের চেহারা বা স্বাস্থ্য দেখে বিশ্রি বলছি বা ভাবছি সেই পুরুষকে কান্তা কিভাবে ভালোবাসবে?

আগে দুষ্টামি করে তাকে বলতাম, ঝুলে পড়ো ওই কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারের গলায়। কিন্তু এখন ভাবলাম, কান্তা ভুল করেনি, সে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে।

আমি ও কান্তা ছিলাম শুধুই বন্ধু। একে অন্যকে ভালোবাসতাম। তবে প্রেমিক–প্রেমিকা হিসেবে নয়, ভালো বন্ধু হিসেবে।

মুনির সাহেব বললেন, সুমন সাহেব বসেন, আমি আপনার কথা খুব শুনেছি কান্তার কাছে। খুব দেখার ইচ্ছা ছিল, আজ সাক্ষাতে খুব খুশি হলাম।

একটু পরে তিনি উঠে গেলেন ভেতরে। ভাবলাম। তিনি হয়তো বাথরুমে গেছেন। জিন্সের পকেট থেকে লাইটার ও জ্যাকেটের পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালাম সিগারেটটা।

কান্তা তখন বললো, সুমন, আমার বিয়ে বোধহয় তার সঙ্গেই হবে।

আমি যেন আজ অবাকই হবো শুধু। কান্তা সব খুলে বলাতে জানলাম, মুনির কান্তার মনটা না পেয়ে সরাসরি কান্তার মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। আর কান্তার মাও ইঞ্জিনিয়ার পাত্র, তাও ইনডিয়ান ডিগ্রিধারী বলে এক বাক্যে রাজি।

কান্তাকে বললাম, প্রত্যাখ্যান করতে।

কিন্তু কান্তা কিছুই বলতে পারছে না।

এর মাঝে মুনির এক কাপ চা ও কিছু বিস্কিট এনে আমার সামনে রাখলো।

নিরবে চা খেলাম। মুনিরের সঙ্গে হালকা কথাবার্তা বলছি, এক সময় সে উঠে অন্য রুমে গেল। তখন কান্তা এমন এক কথা বললো যে, নিজের রাগ সামলাতে পারিনি।

কথাটা ছিল, এই সুমন, আমি তাকে বিয়ে করবো। কিন্তু এটা আসলে বিয়ে নয়, হবে আমার আত্মহত্যা।

শুনেই ঠাশ করে কান্তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলাম। কান্তার পিছে তাকিয়ে দেখি একটু দূরে মুনির দাড়িয়ে আছে।

চুপচাপ চলে এলাম সেখান থেকে। আর যাইনি। প্রায় মাস দুই পরে এক শুক্রবারে সন্ধ্যায় বাসায় খুব অতিথি, মা পিঠা তৈরি করছেন এমন সময় কান্তা হাজির। হাতে বিয়ের কার্ড।

মা তাকে আটকে রেখে পিঠা খাওয়ালেন। কিন্তু আমি তার সঙ্গে তেমন কথাও বলিনি। তাকে শুধু বন্ধু ভেবেছি সর্বদা। সেই বন্ধুর এই করুণ পরিণতিটা মেনে নিতে পারছিলাম না।

একবার ইচ্ছা হলো কান্তাকে বলি যে, আয়, আমি তোকে বিয়ে করবো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ও চিন্তা বাদ দিলাম। কেননা আমি ভালোবাসি আমার অন্য এক বান্ধবীকে এবং সেও ভালোবাসে আমায়। আজ সেই বান্ধবী আমার স্ত্রী।

দেখলাম নীরবে কান্তা চলে যাচ্ছে।

তার বিয়ের কার্ডটা খুলেও দেখিনি, বিয়েতেও যাইনি।

সেই থেকে বন্ধ হলো আমার প্রিয় রঙ চা খাওয়া। অনেকের হাতেই রঙ চা খেয়েছি। কিন্তু কান্তার হাতের সেই চায়ের স্বাদ আজও পাইনি।

জানি কান্তা, এই লেখা প্রকাশ হলে তুই পড়বি। মনে রাখিস, আজও খুব মিষ্টি করে বানানো তোর সেই চা ভুলিনি। তোর সেল নাম্বার পেয়েছি ঠিকই কিন্তু কথা বলি না ইচ্ছা করে। তোর সঙ্গে কথা বলতে গেলে বা ও

কথা ভাবলে খুব কষ্ট হয়। তোর জন্য আমি ভালোবেসে আজ আমার প্রিয়াকে প্রেমিকা থেকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েছি।

আর তুই? জানি না কেমন আছিস, দোয়া করি যেন তুই ভালো থাকিস। মনে রাখিস এই বন্ধুকে আর ক্ষমা করিস তোর বিয়েতে না যাওয়ার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তোর সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। কারণ আজও আমি তোর মতো সুন্দরী মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে মুনিরের বিয়ে মানতে পারিনি।

সিলেট থেকে

কলকাতার ভদ্রতা

– ঊষা

অফিস থেকে একটি ট্রেনিংয়ে আমাদের কয়েকজনকে ব্যাঙ্গালোর পাঠানো হয়েছিল। ফিরতে হবে বাইরোডে। আমরা ব্যাঙ্গালোর থেকে বাহাত্তর ঘণ্টা ট্রেন জার্নি করে দুপুর একটায় কলকাতা পৌছলাম। এখানেই এক রাত বিশ্রাম করে পরের দিন দুপুর দুইটায় আবার আমরা রওনা হবো। হাতে একটু সময় থাকায় কেউ কেউ বিকেলে কেনা–কাটার ইচ্ছা প্রকাশ করলো।

আমার একটা দায়িত্ব ছিল এক ভদ্রলোককে দুটি সিডি পৌছে দেয়ার। তাই আমার এক সহকর্মী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার সঙ্গে সে এক বাসায় যাবে কি না।

সে রাজি হয়ে গেল। বিকেলে কেনাকাটা করে সন্ধ্যায় ভদ্রলোকের বাসায় গেলাম।

কলিংবেল বাজাতেই এক ভদ্রমহিলা (গৃহকর্ত্রী কি না জানি না) দরজা খুললেন।

আমরা জানালাম যে, আমরা (ভদ্রলোকের নাম)–এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ভদ্রমহিলা বললেন, তিনি তো বাসায় নেই, এসে পড়বে, আপনারা ভেতরে এসে বসুন।

ড্রয়িংরুমে বসিয়ে ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেলেন।

ঘড়িতে তখন সাতটা বাজে। দুজন বসে আছি, কথা বলছি। এদিকে এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। ভদ্রলোকের আসার নাম নেই।

আরো কিছু সময় বসে থাকার পর এক সময় দেখি পৌনে নয়টা বাজে।

ভদ্রমহিলাকে বললাম, আমরা এখন আসি, ওনাকে (ভদ্রলোককে) এই সিডি দুটো দেবেন।

ভদ্রমহিলা বললেন, আরেকটু বসতেন, চা করতাম।

প্রায় দুই ঘণ্টা বসে থাকার পর চায়ের এই নিমন্ত্রণ আমাদের রক্ষা করা সম্ভব হলো না।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

সুঘটনা

– খালেদুল হক ইমরান

এইচএসসি পাসের পর অনেক চেষ্টা, ত্যাগ ও সাধনার পর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লোক প্রশাসন বিভাগে ভর্তি হলাম। ভর্তির মাস খানেক পর আমাদের ক্লাস শুরু হলো। প্রথম বিশ পচিশ দিন শুধু দুটি কোর্সের মধ্যে ক্লাস সীমাবদ্ধ ছিল। বাকি দুটি কোর্স শুরু হবে হবে বলে হচ্ছে না।

মাস খানেক পর তৃতীয় চতুর্থ কোর্স শুরুর নোটিশ পাই। নতুন এ দুটো কোর্সের শিক্ষক ছিলেন ম্যাডাম। আগের দুটি কোর্সের শিক্ষকও ছিলেন ম্যাডাম অর্থাৎ ফার্স্ট ইয়ারের সব কোর্সের শিক্ষক ছিলেন ম্যাডাম। আজকে একশ তিন নাম্বার কোর্সের প্রথম ক্লাস। ক্লাসরুম ছাত্রছাত্রীতে পরিপূর্ণ।

যথাসময়ে ম্যাডাম ক্লাসে এলেন। ক্লাস শুরু হলো। ক্লাসে তার উপস্থাপনা, বাচনভঙ্গি, পড়ানোর স্টাইল ছিল একেবারে আলাদা। ছাত্রদের কিভাবে মনোযোগ সহকারে ক্লাসে ধরে রাখতে হবে তা তার জানা ছিল।

কিছুদিন পর ফার্স্ট ইয়ারের টিউটোরিয়াল গ্রুপ তৈরি হলো। বিশ বাইশ জন ছাত্রছাত্রী দুজন শিক্ষকের অধীনে ক্লাস করতো। মনে মনে চাইতাম এ ম্যাডামের গ্রুপে আমার ক্লাস পড়ুক। ভাগ্য আমার সহায় হয়নি। ম্যাডামের গ্রুপে যারা পড়েছে তারা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করলো। এভাবে ফার্স্ট ইয়ার শেষ হলো।

সেকেন্ড ইয়ারের ক্লাস শুরু হলো। এ ইয়ারে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। এ ইয়ারে ম্যাডামের নিয়মিত ক্লাস না থাকলেও টিউটোরিয়াল ক্লাস পড়লো তার সঙ্গে। এ ইয়ারে কমপিউটারের একটি ফান্ডামেন্টাল কোর্স করতে হবে। এ বাবদ আলাদা করে কিছু টাকাও নেয়া হলো। আমাদের ডিপার্টমেন্টে বারোটি কমপিউটার নিয়ে একটি ছোট ক্লাব ছিল। আমাদের বিভাগে কোনো শিক্ষক কমপিউটারে দক্ষ না থাকায় ভূগোল বিভাগের এক রুক্ষ টিচার দিয়ে আমাদের ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। আমাদের কমপিউটার রুম ও ওই ম্যাডামের রুম একেবারে পাশাপাশি ছিল।

আমার কমপিউটার ক্লাস ও ম্যাডামের টিউটোরিয়ার ক্লাস একই দিনে পড়লো। তবে কমপিউটার ক্লাস আগে ও ম্যাডামের ক্লাস পরে। প্রথম দিনের কমপিউটার ক্লাস করতে গিয়ে পড়লাম এক বিপদে। বারোটি কমপিউটারের মধ্যে সাতটিই নষ্ট। বাকি পাচটি কমপিউটার দিয়ে পচিশজন ছাত্রকে ক্লাস করাতে হবে।

আমাদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল কমপিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি বিক্রির। খুব ছোটবেলা থেকে এগুলো দেখতে দেখতে খুব সহজেই ছোট ছোট সমস্যাগুলো সারাতে পারতাম। তাই স্যারকে বললাম, আপনি অনুমতি দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারি নষ্ট কমপিউটারগুলো ঠিক করতে পারি কি না।

এ ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা আছে জেনে স্যার আনন্দে রাজি হলেন।

চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে চার পাচটি ঠিক করে ফেলি। মূলত কম্পিউটারের হার্ডওয়ারে কোনো সমস্যা ছিল না। ছাত্রছাত্রীরা না বুঝে চালনা করার ফলে এর প্রোগ্রামগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে।

দুই তিনটা বাকি থাকতেই ক্লাসের সময় শেষ। এর পরের ক্লাস আবার ম্যাডামের সঙ্গে। স্যারকে ম্যাডামের ক্লাসের কথা বললাম।

স্যার বললেন, আর মাত্র দুই তিনটা বাকি আছে, আমি ম্যাডামকে বলে আসি। আরেকটু চেষ্টা করে দেখো, মনে হয় পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে ঠিক করতে পারবে। তারপর না হয় ম্যাডামের ক্লাসে যাবে। আমি ম্যাডামের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসি।

সব কমপিউটার ঠিক করে যখন ম্যাডামের ক্লাসে যাই তখন ক্লাস প্রায় শেষ। ম্যাডামের ক্লাসে ঢুকে সব বিস্তারিত বললাম। সবগুলো কমপিউটার চালু হওয়ার কথা শুনে তিনিও খুশি হলেন। এমন সময় ক্লাসের সময় শেষ হলে গেল।

ম্যাডাম বললেন, এরপর ফার্স্ট ইয়ারের সঙ্গে আমার একটি ক্লাস আছে। ক্লাস শেষে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে।

ক্লাস থেকে বের হয়ে চিন্তা করতে লাগলাম, কেন তিনি আমাকে দেখা করতে বললেন! ক্লাস না করে কোনো ভুল করিনি তো? নাকি অন্য কোনো ব্যাপার এভাবে হাজারটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো।

যাক, নির্দিষ্ট সময়ে ম্যাডামের রুমে গিয়ে হাজির হলাম।

ম্যাডাম বললেন, তার বাসার কমপিউটারটি দুই তিন দিন ধরে নষ্ট। বিশ্বস্ত লোক ও সময়ের অভাবে আর ঠিক করা হয়নি।

তুমি তো দেখছি এ বিষয়ে বেশ ভালোই জানো। আমার কমপিউটারটা একটু দেখে দেবে?

সানন্দে রাজি হলাম। ম্যাডাম বাসার ঠিকানা ও ফোন নাম্বার দিয়ে সম্ভব হলে দুই একদিনের মধ্যেই যেতে বললেন।

আগামীকাল বিকেলেই যাবো বলে ম্যাডামকে বললাম।

ম্যাডামের রুম থেকে বেরিয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হলো। কারণ যদি তার বাসা পর্যন্ত যাওয়া যায় তাহলে তার সঙ্গে আমার একটা জানাশোনা তৈরি হবে যা হয়তো ইউনিভার্সিটি জীবনে অনেক কাজ দেবে। কমপিউটার আমি যদি ঠিক নাও করতে পারি তাহলে দোকানের লোক এনে ঠিক করাবো বলে ভেবে রাখলাম।

পরদিন বিকেলে ঠিকানা মতো ম্যাডামের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। আকর্ষণীয় সব আসবাবপত্র দিয়ে ঘর সাজানো। সব কিছুতেই সুরুচির ছাপ। আমি ড্রয়িংরুমে বসে ম্যাডামের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পর ম্যাডাম এলেন।

দাড়িয়ে সালাম দিলাম।

ম্যাডাম বললেন, বসো। চা নাশতা করো, তারপর কাজ শুরু করো।

বললাম, চা নাশতা কাজের মধ্যেই না হয় করা যাবে।

ম্যাডাম মুচকি হেসে আমাকে একটা রুমে নিয়ে গেলেন।

অনেক বইপুস্তক দেখে মনে হলো এটা ম্যাডামের রিডিংরুম। রুমের এক কোণে ছিল কমপিউটারটি। কমপিউটারটি দেখতে লাগলাম। এমন সময় ম্যাডামের ছোট দুটি বাচ্চা এসে হাজির। তারা মনোযোগ দিয়ে আমার কাজ দেখতে লাগলো। ম্যাডাম ওদের অন্য রুমে যেতে বললেও ওরা যেতে নারাজ। আমি যে পোর্ট ও পিনগুলো খুলে রাখি সঙ্গে সঙ্গে ওরা তা গুছিয়ে রাখে আর মাঝে মধ্যে এটা–ওটা নিয়ে লড়াইও করে।

এমন সময় ম্যাডাম চা নাশতা নিয়ে এলেন।

আমি সিপিইউ আলাদা করে এর মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কি না তা দেখার জন্য ফ্লোরে বসে একটু একটু চা খাচ্ছি আর দেখছি। এক সময় কাপটি কমপিউটার টেবিলের ওপর রাখা। এমন সময় ওই ছোট দুই ভাইবোনের দুষ্টামিতে চাসহ কাপটি আমার চোখ ও মুখের ওপর পড়লো।

ছেলেটি দৌড়ে গিয়ে ম্যাডামকে ডেকে নিয়ে এলো।

ম্যাডাম এসে ছেলেকে দুই একটি চড় দিয়ে কি করবেন বুঝতে পারলেন না। এর মধ্যে আমার মুখ লাল হয়ে কয়েকটি ফোসকা পড়লো।

ম্যাডাম বললেন, তোমার আজ আর কাজ করার দরকার নেই। চলো তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।

বললাম, এ আর এমন কি, কিছুক্ষণ পর এমনি ঠিক হয়ে যাবে।

ম্যাডাম বললেন, শরীরের অন্য কোনো স্থানে হলে কথা ছিল। কিন্তু মুখে যেভাবে ফোসকা পড়েছে তাতে মনে হয় স্থায়ীভাবে ক্ষতের সৃষ্টি হবে।

এরপর স্থানীয় একটি ক্লিনিকে গিয়ে ফোসকাগুলো ড্রেসিং করে হালকা ব্যান্ডেজ করে দিলেন।

ম্যাডাম বললেন, আজকে তোমার আর বাসায় যাওয়ার দরকার নেই। তুমি আমার বাসায় থাকো।

আমি না বললেও তিনি এক রকম জোরাজুরি করে তার বাসায় রেখে দিলেন।

রাতে শরীরে হালকা জ্বর এলো। ম্যাডামের উৎকণ্ঠা ও সেবা শুশ্রূষা দেখে অভিভূত হলাম। তার মুখে সব সময় বিষণ্ণতার ছাপ।

তাকে অনেক বোঝালাম। ওরা বাচ্চা মানুষ, দুষ্টামির বশে চা ফেলে দিয়েছে।
ম্যাডাম বললেন, তারপরও কেন জানি নিজেকে অপরাধী মনে হয়।
পরদিন সকালে বাসায় এলে বাসার সবার মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে গেল। কেউ বললো, তোকে এমনভাবে কে মারলো। কেউ বললো, কোথায় এক্সিডেন্ট করলি। কিভাবে করলি।
ঘটনার বিস্তারিত শুনে সবাই শান্ত হলো।
যাক, কিছুদিন পর আবার ক্লাস শুরু করলাম।
বন্ধু-বান্ধবরা মুখের দাগের কথা জিজ্ঞাসা করা শুরু করলো।
বললাম, রিকশা থেকে পরে মুখের এ অবস্থা হয়েছে।
ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করে বললাম, এখন আর কোনো সমস্যা নেই। ডাক্তার কয়েকটি ওষুধ ও কৃম দিয়েছেন। বলেছেন নিয়মিত ব্যবহার করলে পাচ ছয় মাসের মধ্যে দাগ চলে যাবে।
এরপর থেকে ম্যাডাম আমার পড়াশোনার যে কোনো ব্যাপারে পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিতেন। প্রয়োজনীয় বই কোথায় পাওয়া যাবে, কোনো কোনো বই ডিপার্টমেন্টের সেমিনারে পাওয়া না গেলে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি থেকে তা তুলে দিতেন। কোনো প্রশ্ন নোট করার পর তা দেখে দিতেন ও প্রয়োজীয় সংশোধন করে দিতেন। আমারও পড়ার প্রতি উৎসাহ বেড়ে গেল। ফলে অনেক ভালো রেজাল্ট নিয়ে অনার্স ও মাস্টার্স পাস করলাম। পরবর্তীকালে চাকরির ক্ষেত্রেও ম্যাডামের সমান সহযোগিতা পেলাম। তার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এমন একটি চাকরি পেলাম যা আমার আশাতীত ছিল।
আমার জীবনে বর্তমানের এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে শুধু ম্যাডামের সহযোগিতার কারণে। তার সঙ্গে এই সহযোগিতামূলক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল চায়ের বদৌলতে। তাই একে দুর্ঘটনা না ভেবে *সুঘটনা* বলেই আখ্যায়িত করলাম।

মিরপুর থেকে

হবিগঞ্জের বাগানে

– মোহাম্মদ সজীব উল্লাহ সাজু

একটি বহুজাতিক কম্পানির দুটো চা বাগান অডিটে গিয়েছিলাম হবিগঞ্জে, গত বছরের শেষ দিকে। দুজনের টিম, সঙ্গে একজন সিনিয়র। আমার মনে খুশি ধরছিল না। কারণ প্রথমবার যাচ্ছি। তিনি অবশ্য আগে গিয়েছেন। তাই এতোটা উচ্ছ্বসিত হননি।
যাক, ট্রেনে চড়ে রওনা দিলাম নির্দিষ্ট দিনে। স্টেশনে আমাদের রিসিভ করলেন টি এস্টেটের সহম্যানেজার মাসাদভাই। গাড়িতে চড়ে যখন শহরের গণ্ডি পেরিয়ে চা বাগানের এরিয়াতে ঢুকলাম তখন দেখলাম চারপাশে ছোট-বড় পাহাড় আর উচু-নিচু টিলা সবই চা গাছে পরিপূর্ণ। তবে সমতল ভূমিও ছিল। পেছনে ঝাপি বেধে মহিলারা চা পাতা তুলছে, পুরুষও আছে। সংখ্যায় কম। চারপাশের সবুজ আমাকে মুগ্ধ করলো।
কিছুক্ষণ পরই আমরা এসে পড়লাম আমাদের গন্তব্যস্থলে। উঠলাম মাসাদভাইয়ের বাংলোতে। বাংলোটা একটু উচুতে হওয়ায় চারপাশে চা বাগান দেখতে চমৎকার লাগে।
এরপর ফ্রেশ হয়ে গেলাম অফিসে। বাংলো থেকে অফিস একটু দূরে। এর আগে আমাদের চা দেয়া হলো। এই প্রথম বাগানের চা খেলাম। মনে হলো জীবনে চা বলতে প্রথম আজ কিছু খেলাম। স্বাদের কথা না হয় না-ইবা বললাম। যে কখনো খায়নি সে তা কোনোদিনও বুঝবে না।
যাহোক, আমরা আমাদের কাজ শুরু করলাম। সেখানে আমাদের সহযোগিতা করলেন বাগানের ম্যানেজার ও আরো দুজন সহম্যানেজার।

ওই দিনের মতো কাজ শেষ করে আমরা বাংলোতে ফিরি। বিকেলে বের হলাম চা বাগান দেখবো বলে। চা বাগানের মাঝখানে দেখলাম চিকন গাছ, এগুলোকে শেড ট্রি বলে। আমার কাছে মনে হলো ছায়া দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে চা গাছগুলোকে আদর–যত্নও সে করছে। তবে ভীষণ গরম লাগছিল বাগানের ভেতরে।

কথার ফাকে আমরা চা বাগানের নানান বিষয়াদি সম্পর্কেও খবর নিচ্ছিলাম। প্রতিদিন সকালে শ্রমিকদের কাজ ভাগ করে দেয়া হয়। একে ওরা গুণতি বলে। এখনে যে যে বিভাগে কাজ করে (ম্যানেজার, সহম্যানেজার বাদে) তাদেরকে বাবু বলে। যেমন কেরানিবাবু, টিলাবাবু, স্টোরবাবু, ফ্যাক্টরিবাবু ইত্যাদি। শ্রমিকদের মধ্যে যারা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে তাদের কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। তারা দিন–রাত কাজ করে।

তবে এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করে মহিলারা। বাগানে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। এ কথা শুনে অবাক হলাম, দুপুরে ওদের যাতে ঘুম না আসে সে জন্য চা গাছের কচি পাতা কাচামরিচ দিয়ে বেটে রুটি খায়।

সাহেবদের চলার পথে ওরা হাটে না। যদি কখনো সামনে পড়ে তো সালাম দিয়ে পথ ছেড়ে পেছনে অবস্থান করে, পরে নিজ গন্তব্যের দিকে যায়। ওদের একটা আলাদা এরিয়া থাকে যেখানে অন্য কেউ যায় না।

প্রতিটি ভ্যালিতে আছে শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল যেখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়া হয়। ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুলও আছে। তবে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে বাবা মায়ের আগ্রহ খুবই কম। কোনোমতে স্কুল পাস করিয়ে তাদের সঙ্গে কাজে নিয়ে যায়।

এর ফাকে একদিন গেলাম এই এস্টেটের আরেকটি ডিভিশন যার নাম কাপাই। ওই বাংলোটি পাহাড়ের ওপরে হওয়ায় গাড়ি দিয়ে ওঠার সময় ভীষণ ভয় হলেও চালকের দক্ষতায় ভালোভাবে উঠলাম। উপরে উঠে তো আমি অবাক, এতো সুন্দর পরিবেশ, চারপাশে বড় গাছের মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। বামপাশ দিয়ে একটা ঝরনা বয়ে গেছে। যখন পানি বাড়ে তখন হাটু পর্যন্ত পানি হয়। এর ওপর দিয়েই গাড়ি চালিয়ে যেতে হয়।

ইচ্ছা ছিল একদিন থাকার। কিন্তু কাজ শেষ হওয়ায় আর হলো না। তবে চা খেতে আমরা একদম ভুলিনি। প্রতিটি কাজের ফাকে বাগানের টাটকা চা আমাদের সঙ্গে দিয়েছে।

পরদিন আমরা গেলাম চা তৈরি প্রক্রিয়া দেখতে ফ্যাক্টরিতে। মাসাদভাই আমাদের সঙ্গ দিলেন। প্রথমে চা পাতা শুকিয়ে তা কয়েকটি মেশিনে টুকরো করে সেটা গুড়ো করা হয়। তারপর গ্যাসচালিত মেশিনের মাধ্যমে তাপ দেয়া হয়। এরপর আরেকটি মেশিনে ওইগুলো ঢালা হলে তা বিভিন্ন গ্রেডের চা হয়ে বের হয়। বিভিন্ন গ্রেডের চা হয় যেমন *এফবিওপি, বিওপি, জিবিওপি, পিএফ, ডাস্ট* ইত্যাদি। তখন বুঝলাম আমরা যে চা বাজারে পাই তা কি মানের।

দেখতে দেখতে একদিন কাজ শেষের দিকে এলো। এবার আরেক বাগানে যেতে হবে। বিদায়বেলায় ম্যানেজার ও তার সহকারী সবাই আমাদের বিদায় জানালেন। আমাদের কিছু চা উপহার দিলেন।

এ বাগানটি একটু অন্য রকম। পুরো বাগানটি টিলার ওপর। এখানেও আগের বাগানের মতো সব সুযোগ–সুবিধা থাকলেও নেই মোবাইল নেটওয়ার্ক। এন্টেনা দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানেই শুধু নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়। তবে এতো ঝামেলা করলাম না। থাকি না কিছুদিন নিজের মতো করে। এক সপ্তাহ থাকলাম এভাবে।

আরেকটা ব্যাপার তা হলো, এখানে লেডিদের অর্থাৎ মহিলাদের (শ্রমিকদের ক্ষেত্রে নয়) খুব সম্মান দেয়া হয়। সব কাজে, এমনকি খাবার বেলায়ও তারা অগ্রাধিকার পায়। খেতে বসলে তারা আগে খাবে, মেহমানদারিতে সবার আগে থাকবে ইত্যাদি ব্যাপার। তবে যারা এখানে চাকরি করে তাদেরও প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। সপ্তাহে একদিন ছুটি হলেও কাজ করতে হয়, এমনকি মাঝরাতেও কাজে যেতে হয়। সব কিছু মিলিয়ে এরা যে খুব আরামে থাকে তা নয়।

সুখের দিন যে দ্রুত শেষ হয় তা সত্যি। আমাদের কাজও এক সময় শেষ হয়ে এলো। সেখান থেকেও আমাদের বিদায় নিতে হলো। বিদায়বেলায় আমাদের এখান থেকেও চা দেয়া হলো। হবিগঞ্জে যে কয়েকদিন ছিলাম, খুব শান্তিতে ছিলাম। কারণ সেখানে কোনো পরিবেশ দূষণ, যানজট ছিল না। ছিল শুধু সবুজ আর সবুজ।

নারায়ণগঞ্জ থেকে

কৌতুক

– তানজিনা শারমিন মুক্তা

তিন বন্ধু হোটেলে খেতে এসে প্রথমেই চায়ের অর্ডার দিল। চা হাজির হতেই প্রথম বন্ধু এক চুমুকে চা খেয়ে বললো, দুর, এটা একটা চা হলো!

দ্বিতীয় বন্ধু ও তৃতীয় বন্ধু সমস্বরে বললো, তাহলে তুই কি রকম চা খাস?

প্রথম বন্ধু বললো, চুলোয় চা টগবগ করছে, কাপে ঢালি ও খাই।

দ্বিতীয় বন্ধু : ধ্যাৎ, এটা কি একটা চা খাওয়া হলো।

প্রথম ও তৃতীয় বন্ধু : তাহলে তুই কি রকম চা খাস?

দ্বিতীয় বন্ধু : চুলোয় চা টগবগ করছে, মুখে ছাকনি লাগিয়ে চা ঢেলে দিই।

তৃতীয় বন্ধু : আমি প্রথমে পানি খাই, তারপর চা পাতা, চিনি ও দুধ একত্রে মুখে ঢেলে দিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে চুলোয় বসে পড়ি।

সোনাপুর, নোয়াখালী থেকে

নেশা

– আশরাফুর রহমান লাল

খুব সকাল। রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনের পাশে পদ্মা রেস্টুরেন্টে ভুনা খিচুড়ি গোগ্রাসে গিলছি আর বার বার তাকাচ্ছি ঘড়ির দিকে। কিছুক্ষণ পর আন্তঃনগর ট্রেনটি ছেড়ে যাবে। হাতে একদম সময় নেই। তাড়াতাড়ি বিল পরিশোধ করে ভোদৌড়। সময়ের অভাবে নাশতার পর চা খাওয়া হলো না।

ট্রেনে উঠলাম। বুক পকেটে রাখা টিকিটটা মিলিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসলাম। জানালার ধারে সিট। মাথার এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করার জন্য জিনসের হিপপকেটে রাখা ছোট্ট চিরুনি বের করতে গেলাম। হিপপকেটে সব সময় একটা রুমাল, ছোট্ট চিরুনি ও মানিব্যাগ থাকে। পকেটে হাত দিতেই টের পেলাম মানিব্যাগ নেই।

ট্রেনে ওঠার সময় পকেট মারা গেল, না তাড়াতাড়ি বিল পরিশোধের সময় রেস্টুরেন্টে ফেলে এসেছি বুঝে উঠতে পারলাম না। এখন উপায়?

এক কাপ চা না খেলে যে চলবেই না। পকেটে বা অন্য কোথাও একটা পয়সাও নেই। ট্রেনের গতি যতোই বাড়তে লাগলো, আমারও বাড়তে লাগলো টেনশন।

কুষ্টিয়া পর্যন্ত যাবো। সেখানে একদিন থেকে কাজ শেষে ফিরে আসার কথা। কুষ্টিয়াতে বেশ কয়েকজন পরিচিত লোক আছে। তাদের কারো কাছে না হয় টাকা ধার নেবো। কিন্তু কুষ্টিয়া না পৌছা পর্যন্ত আমাকে কপর্দকশূন্য অবস্থায় কাটাতে হবে।

সকালে নাশতার পর এক কাপ চা পান করার অভ্যাস দীর্ঘ দিনের। ভেবেছিলাম ট্রেনে বসেই খেয়ে নেবো। কিন্তু হলো না। ট্রে-তে করে খাবার গাড়ির লোকেরা চা নিয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে। চা দেখে চা খাওয়ার নেশাটা চাগিয়ে উঠছে।

আমার সামনে এক ভদ্রলোক। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তার ডান পাশে, ঠিক আমার সামনে জানালার ধারে এক তরুণী। সম্ভবত তার মেয়ে। বয়স সতেরো আঠারো। বেশ সুন্দর দেখতে মেয়েটি। তাকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে সময়টা বেশ পার হয়ে যেতো। কিন্তু চায়ের নেশাতে কিছুই ভালো লাগছে না।

ভদ্রলোক দুই কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন।

ফর্শা সুন্দর পেলব হাতে চায়ে ছোট্ট করে চুমুক দিচ্ছে মিষ্টি ঠোটে।

আমি হ্যাংলার মতো তাকাচ্ছি। চায়ের নেশাকে দমন করার জন্য মেয়েটার শরীরের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলাম।

নীল রঙের কামিজ পরে আছে মেয়েটি। তার শরীর থেকে পারফিউমের গন্ধ নাকে এসে লাগছে। তার হাতের আঙুলগুলো কি সুন্দর! পাতলা ঠোট। গণ্ডদেশ শাদা গোলাপের মতো কোমল ও মসৃণ। তবুও ভালো লাগছে না। তাদের সঙ্গে এক কাপ চা খেতে পারলে দারুণ হতো।

জানালার বাইরে তাকাচ্ছি। দ্রুত অতিক্রম করছি সবুজ ধানের ক্ষেত, পুকুর-ডোবা, মাঠ-ঘাট, গাছ-পালা। চোখ জুড়ানো দৃশ্য খুব বাজে লাগছে। এক কাপ চায়ের জন্য ভেতরটা ছটফট করছে। ট্রাভেল ব্যাগের আনাচে-কানাচে খুব হাতড়ালাম যদি কোথাও দুই একটা কয়েন লুকিয়ে থাকে।

পাওয়া গেল না কিছুই। ঘণ্টা খানেক পর ভদ্রলোক আবার চায়ের অর্ডার দিলেন।

আবারও মিষ্টি মেয়েটা চায়ে চুমুক দিচ্ছে।

মনে মনে ভাবলাম, ভদ্রতার খাতিরে কি তারা এক কাপ চা আমাকে অফার করতে পারে না?

চায়ের নেশার ঝোক ফেরানোর জন্য ব্যাগ থেকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *মানবজমিন* উপন্যাসটা বের করলাম। আগের রাতে একশ তেষট্টি পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছি। একশ চৌষট্টি পৃষ্ঠায় চোখ বোলাতে গেলাম।

পৃষ্ঠার শুরুতেই আছে *হাতের আঙুলগুলো লক্ষ্য করছিল দীপনাথ। বীথির মতো এতো সুন্দর লম্বাটে, ললিত আঙুল সে জীবনে দেখেনি। চায়ে নিঃশব্দে ছোট একটা চুমুক দিয়ে বীথি বললেন, আজ অফিস থেকে ফিরতেও দেরি হয়ে গেল। রান্নার গ্যাসও ফুরিয়েছে দুই দিন হলো। স্টোভ জ্বেলেই সব করতে হবে।*

বীথির নিঃশব্দে চায়ে ছোট চুমুক কথাটাতে আবারও চাগিয়ে উঠলো চায়ের নেশা। মনটা খারাপ হয়ে গেল আবার। বইটা বন্ধ করলাম।

বগির একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত একবার চক্কর দিলাম যদি পরিচিত কারো দেখা পাই। সৌভাগ্যক্রমে কি একজন পরিচিত মুখের দেখা পেতে পারি না? আমি কি এতোই অভাগা!

দশটার পর কুষ্টিয়া স্টেশনে পৌছলাম। ট্রেন থেকে নেমে ঝটপট হাটতে শুরু করলাম পুলিশ লাইনের দিকে। কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন হাই স্কুলে আমাদের গ্রামের এক ছেলে শিক্ষকতা করে। নাম ইয়াসিন। তার কাছে গিয়ে টাকা ধার নেবো।

সরাসরি টিচার্স কমন রুমে ঢুকে পড়লাম। দেখলাম দুজন পুরুষ শিক্ষক ও একজন মহিলা শিক্ষক চা খাচ্ছে, আর রাজনৈতিক আলাপ করছে। তাদের চা খাওয়া দেখে আবারও চায়ের নেশার ভূত মাথায় চাপলো।

ইয়াসিনের কথা জিজ্ঞাসা করতেই একজন শিক্ষক বললেন, ইয়াসিন বারোটার দিকে স্কুলে আসবেন। আপনি তার বাসায় খোজ নিন।

বাসার লোকেশনটা তিনি জানালেন।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইয়াসিনের বাসার ঠিকানায় পৌছলাম। কলিংবেল টিপতেই ইয়াসিন প্যান্টের বেল্ট লাগাতে লাগাতে দরজা খুললো।

তার ড্রয়িংরুমে বসলাম। কিছুক্ষণ পর সে ট্রেতে করে বিস্কিট ও চানাচুর নিয়ে এলো।
বললাম, আমি এসব কিছুই খাবো না। তুমি কি আমাকে এক কাপ চা দিতে পারো?
ইয়াসিন বললো, না ভাই, আমি দুঃখিত। ছোট বোনটা কলেজে গেছে। এখন স্টোভ জ্বালানো ঝামেলা।
আমার দুরবস্থার কথা সংক্ষেপে বলে তার কাছে পাচশ টাকা ধার চাইলাম।
সে পকেট থেকে পাচটি একশ টাকার নোট আমাকে দিল।
সোজা রিকশা নিয়ে ছুটলাম চায়ের দোকানের দিকে। তার আগে সিগারেটের দোকান থেকে এক প্যাকেট গোল্ডলিফ সিগারেট নিয়ে একশ টাকা খুচরা করে নিলাম। রেস্টুরেন্টে ঢুকেই বললাম, তাড়াতাড়ি এক কাপ দুধ চা।
বয় বললো, স্যার, দুধ চা হবে না, লাল চা।
ধুৎতেরি! ছুটলাম আরেকটা চায়ের দোকানে। সেখানে মিললো আমার পরম কাঙ্ক্ষিত এক কাপ চা। ধূমায়িত চায়ে চুমুক দিচ্ছি। মনে হচ্ছে প্রিয়ার উষ্ণ ঠোটে চুমু দিচ্ছি।
এক ধরনের আনন্দের শিহরণে মনটা চনমন করে উঠলো।

ভোলাহাট, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে

বেড়াল

– মাফুজা খানম জলি

আমাদের বাড়ির ঐতিহ্য বেড়াল পোষা। একটা বেড়াল আমাদের বাড়িতে থাকা চাই–ই চাই। বেড়াল যদি অসুস্থ হয় বা অ্যাকসিডেন্ট করে তবে প্রয়োজনে বাড়িতে ডাক্তার ডেকে এনে চিকিৎসা করানো ও প্রয়োজনীয় ওষুধ–পথ্যসহ উন্নতমানের সেবা–যত্ন দেয়া হয় উন্নত দেশের মতো। তিন বছর আগে আমাদের একটি বেড়াল ছিল, তার নাম ছিল *অসিন*। সে দুধ চা খেতে খুবই পছন্দ করতো।
যখনই দুধ চা তৈরি করা হতো, যেখানেই থাকুক না কেন, ঘ্রাণ পেয়ে মিউ মিউ করতে করতে বাড়িতে ছুটে আসতো। অবশ্য তার এ অদ্ভুত নেশাটা আমিই করিয়েছিলাম।
যা হোক, গ্যাসের জ্বলন্ত চুলার কাছে এসে দুই হাত চুলার ওপর উঠিয়ে দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখতো হাড়িতে দুধ চা, না লাল চা তৈরি করা হচ্ছে। যদি দেখতো দুধ চা তৈরি করা হচ্ছে তাহলে খুশিতে গলার ভেতর থেকে গর গর শব্দ করতো আর যদি দেখতো লাল চা তাহলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে যেতো।
দুঃখের বিষয়, আমাদের সেই বেড়ালটা রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছে। বিশ্ব রোড হওয়াতে বাড়ির দুই পাশে রাস্তা আর মাঝখানে আমাদের বাড়িটা দাড়িয়ে আছে। বর্তমানে খুব সাবধানে বেড়াল পুষতে হয়।
এখন আমার বড় আপার বাড়িতে একটা বেড়াল আছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, দেখতে বেশ কিছুটা অসিনের মতো এবং সেও দুধ চায়ের খুবই ভক্ত। বড় আপার বাড়িতে গিয়ে যখন দুধ চা তৈরি করি তখন সে আমার আশপাশে ঘুর ঘুর করে। চা তৈরি করা হলে খেয়ে চলে যায়। দিতে দেরি হলে রাগে মিউ মিউ করে। থাবা দিয়ে দৌড় দেয় আবার কাছে আসে।

ফকিরহাট, বাগেরহাট থেকে

চা- চা কাহিনী

– চৌধুরী ওয়াহিদুর রব

সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত আছে, একদা অন্য ডিস্ট্রিকস–এর এক ভদ্রলোক গিয়েছিলেন সিলেটি আরেক ভদ্রলোকের বাড়িতে বেড়াতে। তাকে প্রথমেই চায়ের সঙ্গে কমলা খোসা ছাড়িয়ে রোয়া রোয়া করে দেয়া হয়েছিল।

ভদ্রলোক কমলার রোয়াগুলোকে টা মনে করে চায়ে ভিজিয়ে খেয়েছিলেন।

দেশে গড়ে প্রতি বছর চায়ের উৎপাদন পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন মিলিয়ন কেজি। এর মধ্যে চল্লিশ মিলিয়ন কেজি চা দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত হয়। বাকি দশ থেকে পনেরো মিলিয়ন কেজি চা বিদেশে রফতানি হয়ে থাকে। এ থেকে আয় হয় বছরে ত্রিশ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। রফতানিকৃত চায়ের শতকরা আশি শতাংশ পাকিস্তানে যায়। একটা সময় ছিল যখন আমাদের দেশ চা রফতানি করে প্রতি বছর দুইশ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতো। চা দেশের সরকারকেও অর্থনৈতিকভাবে চাঙ্গা করে।

চা শুধু দেহ মনকে চাঙ্গা করে না, আমাদের দেশের অনেক দরিদ্র সংসারের চাকাকেও চাঙ্গা রাখে। একবার এ রকমই এক পরিবারের ছেলে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চা বিক্রি করে দুপুরের দিকে এক ভদ্রলোকের ডাকে তার বাড়িতে চা বিক্রি করতে ঢোকায় ছেলেটিকে কুকুর তাড়া করলে সে দৌড় দিতে গিয়ে পড়ে গিয়ে তার ফ্ল্যাস্ক দুটি ভেঙে যায়। ফলে তার সে কি কান্না। *ও আল্লাহ! আমার সব পুজি গেল গো, এখন আমি আমার অসুস্থ মা ও ভাই-বোনকে নিয়ে পথে পথে ভিক্ষা করতে হবে গো, ও আমার আল্লাহ গো।*

জানি না সে এখন কি করছে।

পুরান ঢাকা হলো বড় চা ব্যবসায়ীদের চায়ের আড়ত। এখান থেকে যেসব জেলায় চা উৎপন্ন হয় না সেসব জেলায় চা বিপণন করা হয়। এক ভদ্রলোক শেয়ারে তার দুলাভাইয়ের সঙ্গে চায়ের ব্যবসায় নামেন। দুজনে ভালোই ব্যবসা করতে থাকেন। ভদ্রলোক এক পর্যায়ে তার দুলাভাইকে কোনো কাগজপত্র না থাকায় ব্যবসা থেকে বের করে দেন। কিছুদিন একা ব্যবসা করতে থাকেন।

একদা চায়ের ব্যবসায় লাভ নেই দেখে আড়তটি বিক্রি করে একটি ফার্মাসি খুলে ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু তার কয়েক বছর পর সেই চায়ের আড়তটি সেই দুলাভাই-ই কেনেন এবং আরো দুটি আড়ত দুই স্থানে স্থাপন করেন।

অন্যদিকে সেই ভদ্রলোক অবশেষে ফার্মাসি ব্যবসায় লস দিয়ে অন্য একটি ফার্মাসিতে সেলসম্যান হিসেবে কাজ করছেন। সত্যিই চা নিয়ে লোভের পরিণতি ভয়াবহ।

এ দেশে পচিশটি চা বাগানের মালিক বিদেশি কম্পানি। তেরোটি বাগানের মালিক *ন্যাশনাল টি কম্পানি।* বাংলাদেশ চা বোর্ডের অধীনে তিনটি বাগান রয়েছে। অবশিষ্ট একশ সতেরোটি চা বাগান দেশি কম্পানি এবং ব্যক্তি মালিকানায় রয়েছে। সিলেট অঞ্চলের চা শ্রমিকরা সেই বৃটিশ আমল থেকে সুবিধা বঞ্চিত। তখনই তাদের বেতন হিসেবে কড়ি দেয়া হতো যদিও তখন বৃটিশ মুদ্রার প্রচলন হয়ে গেছে। তা দিয়ে তারা শুধু এলাকার ভেতরের হাট ও দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনতে পারতো যা ছিল এলাকার বাইরে অচল। সেই দোকানিরা দিন শেষে ফ্যাক্টরি থেকে কড়ি জমা দিয়ে প্রচলিত টাকা নিয়ে যেতো।

চা শ্রমিকরা যাতে ভালো শিক্ষার আলো না পায় সে জন্য ফ্যাক্টরি এলাকায় এতো উন্নত ঘরবাড়ি তৈরি হওয়া সত্যেও চা বাগান এলাকায় কোনো হাই স্কুল এখনো পর্যন্ত হয়নি। বাবুদের ছেলেমেয়েরা বাগানের গাড়ি করে অথবা সাইকেল বা পায়ে হেটে দূরের হাই স্কুলে পড়ার সুযোগ থাকলেও শ্রমিকদের সেই সুযোগ নেই। একবার এক চা শ্রমিকের ছেলে খুব কষ্ট করে ডিগ্রি পাস করে। চা-ঘর বাবু পদে Walk-in Intervew (ওয়াক-ইন ইন্টারভিউ)-তে সেও উপস্থিত হয়ে সবাইকে অবাক করে দেয়। পরীক্ষায় সে প্রথম হয়। কিন্তু চা শ্রমিকের ছেলে বলে তাকে নেয়া হয়নি। কিন্তু ILO-কে পাস কাটানো যাবে না বলে সে পদটিতে কোনো লোককেই নিয়োগ দেয়া হয় না।

চা শ্রমিক, বিশেষ করে মহিলা শ্রমিকরা কাচা চা পাতার ভর্তা করে নিয়ে আসে। কাজের ফাকে ফাকে তারা তা খায়, এতে নাকি তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

একবার এক ভদ্রলোক শখ করে পাচ তারকা হোটেলে গেলেন হোটেল দেখতে। দেখা শেষে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন কিছু একটা না খেলে আফসোস থেকে যাবে। তাই এক কাপ চা খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। চায়ের অর্ডার দিয়ে বিল বুকে এক কাপ চায়ের দাম একশ টাকা দেখে ভদ্রলোকের আক্কেল গুড়ুম, অক্কা পাওয়ার মতো অবস্থা।

ভদ্রলোককে চা পরিবেশন করার পর প্রথমে এক চামচ চিনি মুখে দেন, তারপর এক চামচ দুধ, এক চামচ চা পাতা মুখে দিয়ে এক পেয়ালা গরম পানি খেয়ে মেঝেতে পরে গড়াগড়ি দিতে থাকলে হোটেল কর্তৃপক্ষ ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে?

তিনি বলেন, চা তৈরি করতে এমন হচ্ছে।

তারা তো ভাবলো চা খেয়ে এমন হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স এনে সঙ্গে একজন লোকসহ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে, সঙ্গে পাচশ টাকা দিয়ে দেয় ওষুধ কেনার জন্য।

পরে জানা যায়, ভদ্রলোক বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরেছিলেন। বাজিতেও জিতেন পাচশ টাকা। বাজির বিষয় ছিল পাচ তারকা হোটেলে চা খেয়ে বিল না দিয়ে আসতে পারা। মোটের ওপর লাভ এক হাজার টাকা।

বেশ অনেক দিন আগে বিটিভির এক নাটকে আবদুল্লাহ আল মামুনের অল্প বয়স্ক স্ত্রী বিপাশা হায়াত। নাটকের এক দৃশ্যে ছিল, বিপাশাকে চায়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাওয়াবেন মামুন। টিভি পর্দায় স্পষ্ট দেখা গেল চায়ের কাপে বিষ তো দূরে থাক, চা–ই নেই। বিপাশা খালি কাপে চুমুকের মাধ্যমে হাওয়া খাচ্ছেন এবং এক পর্যায়ে তিনি গলা ধরে মাটিতে পড়ে যান। তার মৃত্যু হয়। কি বিচিত্র পরিচালক! এখন অভিনয়ের প্রয়োজনে ডজন ডজন চায়ের কাপই ভেঙে ফেলা হচ্ছে প্যাকেজের কল্যাণে।

এবার আমার জীবনে ঘটে যাওয়া চা কাহিনী। একবার কৈশোরে সিলেটে ফুলতলী সাহেবের ওয়াজ মাহফিলে আমরা কয়েকজন মিলে চা বিক্রির দোকান দিলাম। অনেক কাপ চা বিক্রি করে আমাদের লাভ হলো পঞ্চাশ টাকা। সেই টাকা ভাগাভাগি করে নিতে গিয়ে ঝগড়া হলো।

এমন সময় বড় কয়েকজন ছেলে এসে আমাদের ধরলো, *এরে ওবা দোখান দিয়া চা বেচছো, ভালা কথা, ওখন জাগার ভাড়া একশ টাখা দেও।* বলে আমাদের কাছ থেকে একশ টাকা নিয়ে গেল। কিছুই করতে পারলাম না।

অবশেষে আমরা বললাম, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া–বিবাদ করলে *আমও যাবে ছালাও যাবে।* বুঝতে পারলাম *একতাই বল।*

এইচএসসি পরীক্ষার পর সিলেটের চা বাগানে বেড়াতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, কুলিদের বস্তিতে চা পাতা লুকিয়ে লুকিয়ে বিক্রি হয় চল্লিশ টাকা কেজি করে। ঢাকায় তখন হোটেলগুলোতে চা কিনে আশি টাকা কেজি করে। সাহস করে পাচ কেজি চা দুইশ টাকায় কিনে নিয়ে এলাম। একটি হোটেলে তিন কেজি সত্তর টাকা করে বিক্রি করে দেড়শ টাকা আনলাম। বাকি টাকা পরে আনতে বললো।

এক মাস পরে আরেক কেজি নিয়ে গেলাম।

বললো, টাকা দুই দিন পর নিতে এবং ভালো করে এক কাপ চা খাইয়ে দিল। দুই দিন পর গিয়ে দেখি হোটেল উঠে গেছে।

পরে জানতে পেরেছিলাম, এ চা পাতাগুলো কুলিরা চুরি করে ফ্যাক্টরি থেকে নিয়ে আসে এবং বিক্রি করে। ভাবলাম সেই জন্য ব্যবসায় এ লস। আমি আর কখনো সেখান থেকে চা পাতা ব্যবসার জন্য আনিনি।

সবশেষে একজন গৃহ পরিচারিকার কাহিনী দিয়ে শেষ করছি। জমিরুন তার নাম। কাজ করতো সিলেটের কোনো এক বাগানের এক বাবুর বাসায়। ছোটকাল থেকে সে এই বাসায় কাজ করে। তার যখন রাগ হতো, এক টানা চার থেকে পাচ দিন পর্যন্ত কিছুই খেতো না। কিন্তু যখনই ইচ্ছা হতো, এক ডেক চা তৈরি করে গরম

চা গল গল করে খেয়ে সঙ্গে নাসির বিড়ি পান করে সারা দিন কিছুই মুখে নিতো না এবং কাজেও ফাকি দিতো না। অনেক বয়স হলেও তাকে শত চেষ্টা করে বিয়ে দেয়া যায়নি। কারো বিয়েতে জান-প্রাণ দিয়ে খাটতো। তবে তার চা থাকতেই হবে।

এক সময় কংকালসার এই মহিলাটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়।

ঢাকা থেকে

জোচ্চুরি

– তোফায়েল আহমেদ মিশু

আমি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করি। আমার চাচাতো বোন দুজনের নাম নাজিয়া ও তাজিয়া। ওরা যমজ বোন। ঢাকাতে থাকে। তাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ হয়। তারা সব সময় বলে, আমি যেন তাদের বাসায় যাই। চাচা-চাচিও বলেন। কিন্তু ছুটি কম পাই। তাই বছরে দুই বা তিনবার যাওয়া হয়।

২০০৩ সালে যখন চাচার বাসায় গিয়েছিলাম, সে কথা স্পষ্ট মনে আছে। ২০০৩ সালের ২০ মে। ছুটি নিয়ে চাচার বাসায় গেলাম। এখানে জানানো উচিত নাজিয়াকে মনে মনে খুব ভালোবাসি। ইশারা-ইঙ্গিতে তাকে জানানোর চেষ্টাও করেছি। সে বুঝেছে কি না বুঝতে পারিনি। তবে এখানে তাজিয়াকে নিয়ে সমস্যা হয়েছে। বুঝেছি তাজিয়া কোনো এক রহস্যময় কারণে আমাকে খুব পছন্দ করে।

একদিন আমাকে একা পেয়ে তাজিয়া সরাসরি প্রস্তাবও দিয়েছে।

আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছি।

আমি বাসায় যাবার পর সেদিন বিকেলে চাচা-চাচি শপিংয়ে বের হলেন। নাজিয়া, তাজিয়ার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি।

তখন তাজিয়া জানালো, আমি সিলেট থেকে যাবার সময় যে ক্লোন চাপাতা নিয়ে গিয়েছি সে চাপাতা দিয়ে ও নিজ হাতে চা তৈরি করে খাওয়াবে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে চা তৈরি করতে পারে কি না!

সে জানালো, পারে।

তাজিয়াকে চা নিয়ে আসার জন্য বললাম।

তাজিয়া ভেতরে যাবার পর নাজিয়া বললো, সেও নিজ হাতে চা তৈরি করে আমাকে খাওয়াবে।

কিছু সময় পর নাজিয়া চা তৈরি করে নিয়ে এলো।

অবাক হলাম।

নাজিয়াই জানালো, তাজিয়া একটু পর চা তৈরি করে নিয়ে আসবে।

নাজিয়ার তৈরি করা চা খেলাম। খারাপ না। দশে ছয় পেতে পারে।

সে কাপ খাবার পর তাজিয়া চা নিয়ে এলো।

চা খেলাম। দারুণ চা। দশ-এ নয় পাবার মতো চা। এতো ভালো চা যে তৈরি করতে পারে সে স্পেশাল ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। তাজিয়াকে স্পেশাল ধন্যবাদ দিলাম।

রাতে নাটক দেখার সময় তাজিয়াকে নাজিয়া জিজ্ঞাসা করলো, তুই নাকি ভাই ভাই রেস্টুরেন্ট থেকে চা আনিয়েছিলি?

তাজিয়া থমথমে কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, তোকে কে বলেছে?

নাজিয়া বললো, শাহেদকে দিয়ে চা আনিয়েছিলি। সে জন্য শাহেদ অবাক হয়ে আমাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল।
বুঝে ফেলেছিলাম তাজিয়া নিজ হাতে চা তৈরি করেনি। সে রেস্টুরেন্টের চা নিজ হাতের তৈরি বলে আমার কাছে চালিয়ে দিয়েছে। তার ওই জোচ্চুরির জন্য এখন পর্যন্ত তাজিয়াকে এড়িয়ে চলি।

আখানিয়া, সিলেট থেকে

টাক বিড়ম্বনা

– এসএম কবির

২০০০ সাল। তখন মাত্র অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি। আমরা যারা এক সঙ্গে এইচএসসি পাস করেছিলাম তাদের মধ্যে একমাত্র আমি এই কলেজে ভর্তি হয়েছি। যেহেতু আর কেউ নেই তাই ভাবলাম নতুন কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কয়েক দিনের মধ্যে একজনকে পেয়েও গেলাম। যার নাম হাসান।
তারপর থেকে দুজনে এক সঙ্গে ক্লাস, প্রাইভেট, অবসরে ঘুরতে যাওয়া – এভাবে চলতে থাকলো। এরই মধ্যে আমাদের সহপাঠী একটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার মেসে একদিন বেড়াতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ দিল। ওর নাম রেখা।
আমরা দুজনে গেলাম তার মেসে। অনেক গল্প, হালকা নাশতা এবং আরেকদিন এসে তার হাতের চা খেয়ে যাওয়ার আহ্বান নিয়ে ওই দিনের মতো বিদায় নিলাম। ওই দিন চা না দেয়ার কারণ হলো, সে ওই মেসে নতুন এসেছে, তাই প্রস্তুতি ছিল না।
এরই মধ্যে আমার বন্ধুটি তাদের গ্রামের বাড়ি থেকে ঘুরে এলো এবং সঙ্গে নিয়ে এলো চুলওয়ালা মাথা বাদে টাক মাথা। বুঝেছেন তো নিশ্চয়, বাড়ি গিয়ে চুল ফেলে দিয়েছিল।
যা হোক পরের দিন ক্লাসে গেলাম। রেখা নামের ওই মেয়েটি যে আমাদের ওই সময়ের নতুন বান্ধবী হয়েছে, বলা চলে, সে ওই দিন বিকেলে তার মেসে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ দিল।
আমার বন্ধুটিকে বললাম, এই টাক মাথা নিয়ে মনে হয় মেয়েদের মেসে না যাওয়াই ভালো।
ও বললো, রেখা তার নিজের হাতে বানানো চা খাওয়াবে, না যাওয়াটা কি ঠিক হবে?
বললাম, ঠিক আছে, চল যাই।
আমরা গেলাম এবং তার রুমে বসে কিছুক্ষণ গল্প করে সে চা করতে রান্না ঘরে গেল।
আমরা দুজন বসে আছি। এমন সময় দেখলাম পাশের রুম থেকে একটি মেয়ে তার দুই হাত মার্শাল আর্টিস্টদের মতো বিভিন্ন ভঙ্গি করতে করতে আমাদের দিকে আসছে এবং বলছে, টাক মাথা দেখলে আমার হাতের উল্টোপিঠ মাথায় মারতে ইচ্ছা করে। আমি এখন আপনার মাথায় আমার হাত মারবো, আপনি আপনার ক্যাপটি খুলুন।
আমরা বিপদে পড়ে গেলাম। যাকে চিনি না, সে এমন করছে কেন?
সে নাছোড়বান্দা, তাকে মারতে দিতেই হবে।
সে বললো, আমরা টাক মাথা অতিথিদেরকে এভাবে আপ্যায়ন করে থাকি।
ইতিমধ্যে আমাদের বান্ধবীটি চা নিয়ে রুমে হাজির।
যাহোক তার আসাতে আমরা রক্ষা পেলাম।

যশোর থেকে

লিটন

– নাজমুস সাকিব নভো

আমার চা প্রীতি ছিল অত্যন্ত প্রবল। এই চা পান করাকে কেন্দ্র করে আমার জীবনে রয়েছে এক মর্মান্তিক স্মৃতি।

বছর পাচেক আগের ঘটনা। ঘটনার দিন গরমের ছুটি কাটানোর জন্য বাসে করে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলাম। যানজটের কারণে বাস কিছুক্ষণ পর পর থেমে থেমে ধীর গতিতে এগোচ্ছিল।

দুপুরের দিকে যাত্রাবাড়িতে পৌছালে লম্বা ট্রাফিক জ্যামের কারণে বাস অনেকক্ষণ থেমে ছিল। এরই মধ্যে ভ্রাম্যমাণ হকাররা বাসে উঠে তাদের ব্যবসা শুরু করে দিল। আমার খুব চা খেতে ইচ্ছা করছিল। লক্ষ্য করলাম, হকারদের মধ্যে এক পিচ্চি বিক্রেতাও আছে। তাকে ডাক দিয়ে চা দিতে বললাম।

চা খেতে খেতে তার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, তার নাম লিটন। সে কর্মজীবী বাচ্চাদের স্কুলে পড়ে এবং বাবা–মাকে সাহায্য করার জন্য অবসর সময়ে রাস্তায়, বাসে, কখনো বা ফুটপাথে চা ফেরি করে।

আমার সঙ্গে আনা কিছু হালকা খাবার তাকে খেতে দিই।

সে খুব খুশি হয়।

এর মধ্যে দুই চারজন লোক আমাদের দিকে আড়চোখে দেখছিল।

সে যাক। পরে লিনটকে চায়ের দাম দিতে গেলে সে তা নিতে চাইলো না। বললো, স্যার, *আপনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তাতে আমার মনডা ভইরা গেছে, চায়ের দাম দেয়ার দরকার নেই।*

সে কিছুতেই দাম নিতে চাইলো না।

আমিও নাছোড়বান্দা। কিন্তু তার সঙ্গে পেরে উঠলাম না।

বললো, *স্যার, আপনি তো আমার বড় ভাই। না হলে এতো আদর কইরা আমারে খাওন দিলেন ক্যান? আমি পয়সা নিতে পারবো না।*

যানজট কমে এলে সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাস থেকে কয়েক পা অগ্রসর হতে না হতেই এক দ্রুতগামী মাইক্রোবাসের ধাক্কায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়লো। গাড়িটি তো থামলোই না বরং গতি বৃদ্ধি করে চলে গেল।

চারদিকে হই হই রবে লোকজন জমা হলো।

আমাদের গাড়িটি থেমে গেল।

আমি বাস থেকে নেমে এলাম।

যখন দুর্ঘটনাস্থলে গেলাম তখন সেখানে প্রচণ্ড ভিড়। রক্তাক্ত অবস্থায় লাশ হয়ে লিটন পড়ে রইলো। সে তখন অন্য এক দুনিয়ার বাসিন্দা। তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করা ছাড়া তখন আমার আর কিছুই করার ছিল না। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এলো।

সেগুনবাগিচা, ঢাকা থেকে

নেশার চা

– মোহসীন ভুঞা

মানব সৃষ্ট নানা রকম নেশার মধ্যে বোধ করি চা হলো সবচেয়ে সুস্থ ও নিয়মতান্ত্রিক নেশা এবং এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া শূন্যের কোঠায়। মানুষ কেন নেশা করে সেটা দুর্বোধ্য। কিন্তু সামান্য একটু গরম পানিতে কিছু

পাতা দিয়ে দুধ-চিনি সহযোগে পান করলে নেশা হয় এবং নির্দিষ্ট সময় কেটে গেলে কি যেন নেই নেই লাগে, সেটা বিস্ময়ের।

চা পানের সংস্কৃতিকে বেড টি ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। কিন্তু ভর দুপুরে চা পানের মহিমা কি বুঝতে দেরি হয়েছে। কমলাপুর পীর জঙ্গী মাজার-এর কাছ ঘেষে ইট ও কাঠের তৈরি বেঞ্চে বসে প্রচণ্ড গরমে চায়ের কাপ হাতে দেখে প্রশ্ন করাতে বলেছে, *গরমে গরম যাবে, খাইয়া দেহেন ভেতরে সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবো।*

পাশেরজন জানিয়েছে, *বেলা বারোটা বাজে, অহন পর্যন্ত বওনি করি নাই, খিদা মারার লাইগা চা লইছি।*

দিনমজুর ও গরিব মানুষের চায়ের নেশা হয়তো আছে। তবে কিছু লোক যে অন্য উদ্দেশ্যে চায়ে অভ্যস্ত সেটা জেনে বিব্রত হয়েছি।

দীর্ঘ দিন পর দেশে এসে রাসেল স্কয়ার ঘুরে ফুরফুরে মেজাজে এক রেষ্টুরেন্টের কাছ দিয়ে যেতে দেখি, তাজা সিঙারা ভাজা হচ্ছে। সব নিষেধ ভুলে ঢুকে পড়ি। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা, প্রচুর লোক। বেশির ভাগ অল্প বয়সী উঠতি যুবক। সামনে চায়ের কাপ নিয়ে নিবিষ্ট মনে বসা, তেমন হই হুল্লোড় নেই। বেয়ারারা বেশ সমীহ ও উৎসাহ নিয়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ চোখ যায় একজনের হাতে। খবরের কাগজে মোড়া ছোট একটা বোতল থেকে কি যেন খাচ্ছে। বেশ কয়েকজনকে একই কায়দায় বোতল শেষ করে বেয়ারাদের হাতে দিতে দেখলাম। ফিশফিশানিতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। কাশির সিরাপ ফেনসিডিল পান করছে তারা। অল্প বয়সী ছেলেদের এভাবে নির্জীব নেশাতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া দেখে খারাপ লাগে। দশ টাকার বিনিময়ে জানতে পারি, ঠিক মেইন রোডের ওপর নামকরা এক ফার্মাসি ও পেছনের এক গারাজে গোপনে বেচাকেনা হয়।

অবাক হয়ে ভাবি, কিভাবে সীমান্ত পেরিয়ে নির্বিঘ্নে জীবন ধ্বংসকারী এই নেশার চালান দেশে আসে। চোরাচালান রোধে যারা নিয়োজিত তারা কি এতোটাই অন্ধ অথবা অসহায়? নাকি অর্থলিপ্সা তাদের চোখে ঠুলি এটে দিয়েছে। টাকার নেশায় বিভোর থেকে যারা দেশের মেরুদণ্ডকে ভেঙে দিয়ে নেশার রাজ্যে ডুবিয়ে অথর্ব করে দিচ্ছে তাদের সন্তানেরা অবৈধ টাকায় দেশে-বিদেশে মানুষ হলেই কি নিরাপদ? দেশের প্রচলিত আইন তাদের অপকর্মের নাগাল না পেলেও প্রকৃতি নীরব থাকবে না।

যে চায়ের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রায় নেই বললেই চলে, ফেনসিডিল পানের পর সেটা হয়ে ওঠে নেশার বাহন। কাপের পর কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফেরে এই যুবকেরা। হারাতে থাকে শারীরিক ক্ষমতা, কিডনি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়, জন্ডিসসহ নানান রোগ বাসা বাধে।

পত্রিকায় পড়েছি, কলকাতার রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর মারার পাউডার *ব্রাউন সুগার* নামে এ দেশে পাচার হয়। সীমান্তে অসংখ্য কারখানা গড়ে উঠেছে শুধুই আমাদের দেশে কাশির সিরাপ নামধারী নেশাদ্রব্য পাচারে।

ইনডিয়া থেকে পেয়াজ, মরিচ, ডিম, এমনকি সুই-সুতা এসে আমাদের ক্ষুদ্র অর্থনীতির টুটি চেপে ধরে আগ্রাসী ভূমিকা রাখছে তাতেও আপত্তি নেই। শুধু অনুরোধ, সামান্য মমতা দেখিয়ে এসব মরণ নেশাসামগ্রী পুশ ইন বন্ধের ব্যবস্থা নেয়া হোক। আমাদের প্রজন্মকে আর কতোটা ধ্বংসের প্রান্তে নিয়ে গেলে নীতি-নির্ধারকদের টনক নড়বে জানি না।

ভিয়েনা থেকে
mohsinbhuian@chello.at

তেজপাতা

নিতান্তই দীনহীন দরিদ্র ঘরেই আমার জন্ম। এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। সময়টা ছিল প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমল। ছাত্র হিসেবে খারাপ ছিলাম না। তবে দারিদ্রের জন্য সব সময় ছিলাম কিছুটা অন্তর্মুখী, পরীক্ষার ফল হলো আশানুরূপ। আমার পরিচিতদের কাছে আশাতীত।

সে সময় আমার এক দূরসম্পর্কে মামা চাকরি করতেন ডিফেন্সে। নন–কমিশনড অফিসার। তার মাসিক রেশন বাবার সামান্য পেনশনের টাকায় কিনে নিতাম। এ কাজটির জন্য প্রায়ই আমাকে ক্যান্টনমেন্টে যেতে হতো। সবাই আমাকে বেশ স্নেহ করতো আমার ভালো রেজাল্টের জন্য। একদিন ওনারই এক সহকর্মী যার গ্রামের বাড়ি আমাদের ওখানেই, একান্ত অনুরোধ করলেন তার ছেলেকে যেন একটু বৃত্তির পড়াশোনা দেখিয়ে দিই। ক্লাস ফাইভের বৃত্তির ছাত্র।

কলেজে ভর্তির এখনো দুই এক মাস সময় আছে। জীবনে কখনো টিউশনি করিনি। মাকে এসে বললাম, সেনাবাহিনীর লোক, তার উপর গ্রামের বাড়িও একই এলাকায়।

মা তার অনুরোধ রাখতে বললেন।

এরপর একদিন দুরু দুরু বুকে মায়ের সঙ্গে তাদের বাড়ি গেলাম, পরিচিত হলাম। পরদিন থেকে প্রতিদিন ছেলেকে পড়াতে যেতাম। এমনিতেই খুব সংকোচে থাকতাম। তার উপর ছাত্রের বড় বোন ক্লাস এইটের ছাত্রী, সেও আমার কাছে পড়া নিয়ে আসতো। সাধারণত ওদের পড়া দেখিয়ে বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকতাম। কোনো প্রশ্ন থাকলে সেখানেই এসে জিজ্ঞাসা করে যেতো।

প্রতিদিনই ওরা আমাকে চা দিতো। চা ছিল বিশেষ ধরনের, এমন চা কখনো খাইনি। দুধের পাতলা চা, এর মধ্যে দিতো তেজপাতা। কিছুতেই আমার গলায় ঢুকতো না। সুযোগ বুঝে কেউ যেন না দেখে আস্তে নিচে ফেলে দিতাম।

কিন্তু দুর্ঘটনা একবারই ঘটে। যেটা ঘটলো, আমি না দেখে ফেলতে গিয়ে পড়লো নিচে দাড়ানো কয়েকজন মহিলার ওপর। সৌভাগ্য, ওরা আমাকে দেখেনি। কিন্তু এ বাসা থেকেই যে ফেলা হয়েছে সেটা ওরা নিশ্চিত। প্রচণ্ড হই চই করতে করতে ওরা উপরে উঠে আসতে লাগলো। আমার অবস্থা পাঠক অনুমান করুন। সঠিক বলতে পারবেন বিধাতা। দোতলা থেকে লাফ দিয়ে পালাবো, না কিভাবে এমন দুর্যোগ থেকে মুক্তি পাবো ভেবে আমার সমস্ত শরীর ঘেমে ভিজে উঠলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। তিন চারজন মহিলা হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে কৈফিয়ত নিতে লাগলো। উপর থেকে কে চা ফেলেছে? জানি না তারা কাকে সন্দেহ করছে।

আমি যেন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলাম। আমাকে বিস্ময়ে হতবাক করে আমার সেই প্রিয় ছাত্রী যার সঙ্গে পাঠ্যবই ছাড়া আমার কোনো আলাপই হয়নি সে এসে বললো, খালাম্মা, ভুল করে আমিই উপর থেকে চা ফেলেছি আর কেউ নয়।

পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলো। ভদ্র মহিলারা ছাত্রীকে অল্প বিস্তর শাসনের কথা বলে চলে গেলেন।

আমি নীরবে–নিঃশব্দে সেই যে চলে এলাম আর কখনো যাইনি।

ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে হস্টেলে চলে এলাম জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার লক্ষ্যে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অনেক ঘাত–প্রতিঘাতের মধ্যে এগিয়ে চলছি। গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে অনেক স্মৃতিই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তবে এ ঘটনাটি নয়। এখন কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি চা খাবে, লেবু, না আদা চা?

বলি, দুধ চা উইথ (With) তেজপাতা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

ঢাকা থেকে

iamalmrn@yahoo.com

ভঙ্গি

– খায়রুল ইসলাম

যার কথা লিখছি তিনি আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়া। তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আংশিক পরকীয়া প্রেমের মতো। তার মুখেই তার দুঃখের কাহিনী শুনে ব্যথিত ও মর্মাহত হয়েছিলাম এবং তাকে সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে জড়িয়ে গিয়েছিলাম তার অকৃত্রিম প্রেমে। তার বিবাহিত জীবনে স্বামী–ননদ, দেবর ও শাশুড়ির ভালোবাসা না পেয়ে তিনি ছিলেন জীবনের প্রতি চরমভাবে হতাশাগ্রস্ত। তাকে সহানুভূতি শ্রদ্ধা, ভক্তি আর ভালোবাসা দিয়ে, উপদেশমূলক বাক্য শুনিয়ে কিছুটা হলেও তার জীবনে শান্তি এনে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম।

তিনি খুশিতে আত্মহারা হয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, তুমিই আমার জীবনের শান্তির দূত।

আরো কতো কি যে বলতেন তার ঠিক ঠিকানা নেই। ভালোবাসা বুঝি এ রকমই হয়ে থাকে। যখন তার বাসায় তার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম, তিনি আমাকে দেখে কি যে খুশি হতেন তা পাঠককে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। অনেক লোভনীয় খাবার তিনি আমায় খাওয়াতেন। আমি কি খেতে বেশি পছন্দ করি সে খাবারেরই ব্যবস্থা করতেন। এতো কিছুর মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দের ছিল তার চা নিয়ে আসার ভঙ্গিমা।

চায়ের কাপে চা ও দুধ এক সঙ্গে দিয়ে জ্বাল করতেন। চিনি দিতেন শেষে। তারপর পিরিচের ওপর কাপ রেখে চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে নিয়ে এসে আমার হাতে দিতেন!

রান্নাঘর থেকে ড্রয়িংরুম পর্যন্ত দেখা যেতো। আর এ দৃশ্যটা আমার কাছে কি যে ভালো লাগতো তা বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়।

যাকে ভালোবাসা যায় তার সব কিছুই সুন্দর লাগে। এ কথা একদিন বলাতে তিনিও এতো বেশি খুশি হয়েছিলেন যে এ রূপ দৃশ্য দেখানো থেকে আমাকে বঞ্চিত করেননি। আরো বেশি করে দেখাতে চেষ্টা করতেন।

এরপর দীর্ঘ বিশ বছর অতিবাহিত হয়েছে, তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আর নেই। পরকীয়া প্রেমে ধরা পড়ে কেলেংকারি হতে পারে। সমাজের কাছে, স্বামী–সন্তানদের কাছে, আত্মীয়স্বজনদের কাছে তিনি চরমভাবে অপমানিত হতে পারেন। তাই কৌশলে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি চিরতরে।

কিন্তু তার আদর, স্নেহ, ভালোবাসার কথা, সর্বোপরি চা নিয়ে আসার দৃশ্যটা কিছুতেই ভুলতে পারি না। চায়ের কাপে চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে ধীরগতিতে এগোচ্ছেন, আমার দিকে – পাঠক ভাবুন তো দৃশ্যটা।

রাজশাহী থেকে

দোকানদার

– বাদশা

চা আমার সকল কিছু কেড়ে নিয়েছে।

প্রথম যখন চা খাই তখন মনে হয় ক্লাস থ্–তে পড়ি। আমার মামার বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম সাভার। মামি গরম চা খেতে দিয়েছিলেন আমাকে।

আজ আমি একজন চায়ের দোকানদার। এ কারণে আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিও হারিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বিষয়টা কি তা খোলাসা করে বলি।

আমি গরিব ঘরের ছেলে। লেখাপড়া যা করেছি তাকে লেখাপড়া বলে না।

আমি ছিলাম সাধারণ একটা স্পিনিং মিলের শ্রমিক। ভালোবাসতাম একটা লাল টুকটুকে মেয়েকে ছোট থেকেই। ২০০২ সালে চাকরি বাদ দিয়ে একটা দোকান দিয়ে বসার চিন্তা করলাম। যে ভাবনা সেই কাজ।

বাবা অনেক কষ্ট করে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা চালান হাতে ধরিয়ে দিলেন। সঙ্গে থেকে হাতের কাজ করে দিতেন আমার বাবা। দোকানে চা বিক্রির জন্য সব কিছু কিনলাম। কাপ, পিরিচ, ট্রে, দুধ, চিনি। গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানার নিশ্চিন্তপুরে একটা দোকান ভালোভাবে দিলাম। শুরু হলো ব্যবসায়ী জীবন আমার। চলতে লাগলো সে মেয়ের সঙ্গে আমার ভালোবাসা।

দোকান আমার কর্মচারীর ওপর ফেলে রেখে সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছি মৌচাক স্কাউট উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে অথবা ফজলু নামে এক বড়লোকের বাশ ঝাড়ের নিচে। এভাবে চলতে লাগলো আমার দিন।

কিছুদিন পর আমার কর্মচারী চলে গেল। আরেকজন এলো। সেও চলে গেল। আবার আনলাম, সেও চলে গেল। এখন আমি আবার নিজে বসলাম। কিন্তু হায়। ততোদিনে সব শেষ। কর্মচারীরা ব্যবসার পরিণতি এমন করে ফেলেছে, মাথা উচু করে দাড়ানোর মতো অবস্থা আমার নেই।

শুরু হলো সংগ্রাম। এভাবে চলতে থাকলো দিন। তবে উন্নতি করতে পারলাম না। হয়ে গেলাম চায়ের দোকানদার। সে হয়ে গেল আমার বহু, দূরের মানুষ। কারণ একজন চায়ের দোকানদারের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব একটা মানানসই হবে না। তাই সে তার আপন মনে চলতে লাগলো আমাকে উপেক্ষা করে।

আজ আমি তার চোখে শুধু একজন চায়ের দোকানদার।

সে আমার কাছে আকাশের চাদ।

আমার পরিণতি খুব ভয়ংকর। বাবা দেখতে পারেনা, বন্ধু-বান্ধব আড়চোখে তাকায়। তবু আমার সান্ত্বনা যে আমার চোখের সামনে দিয়ে একবার যায় আর আসে। ওটাই এখন একটা চায়ের দোকানদারের সান্ত্বনা।

নিশ্চিন্তপুর, কালিয়াকৈর থেকে

রহস্য

– মোহাম্মদ ইসহাক মিয়া

১৯৯৫ সালের কথা। তখন আমাদের গ্রামের বেশির ভাগ বাড়িঘর মাটির ছিল। আমাদেরও দুইটি মাটির ঘর ছিল। এরপর একটি ভেঙে পাকা ঘর তৈরির কাজ চলছিল। আর পাকা ঘর নির্মাণের জন্য প্রতিদিন আট দশজন রাজমিস্ত্রি আসতো। তারা সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাজ করে চলে যেতো। প্রতিদিন কাজের মাঝে তাদেরকে চা বিস্কিট দেয়া হতো।

আম্মু চা তৈরি করতেন।

আমি, ভাইয়া অথবা অন্য কেউ তাদেরকে চা নাশতা এগিয়ে দিতাম।

ঘটনার দিন আম্মু চা তৈরি করে চায়ের ট্রের মধ্যে চায়ের কাপগুলো সাজিয়ে (সঙ্গে বিস্কিট) আমাদেরকে খুজছেন। আমাদের কাউকে ধারেকাছে না পাওয়ায় নানু চা এগিয়ে দিলেন। উল্লেখ্য, নানু বৃদ্ধ এবং চোখে একটু কম দেখেন। চা দেয়ার পর রাজমিস্ত্রিদের মধ্যে শুরু হলো হুলুস্থুল কাণ্ড। তাদের ডাকে সবাই কাছে গেলাম। গিয়ে দেখলাম তিন চারজন ওয়াক ওয়াক করছেন।

চায়ের ট্রের মধ্যে তাকাতেই আমাদের চোখ স্থির হয়ে গেল। চায়ের ট্রের মধ্যে চার পাচটি ইদুরের বাচ্চা! দুইটি চায়ের কাপের মধ্যেও দুটি ইদুরের বাচ্চা। বাচ্চাগুলোর চোখ ফোটেনি অর্থাৎ এগুলো হাটতে পারে না, দৌড়াতেও পারে না। এগুলোর গায়ে কোনো লোম ওঠেনি এবং দেখতে হালকা গোলাপি রঙের মতো।

তিনজন চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছিল। তারা ওয়াক ওয়াক করতে করতে তাদের অবস্থা খারাপ।

আম্মু বললেন, আমি যখন চা তৈরি করে সাজিয়ে দিয়েছিলাম তখন কোনো ইদুরের বাচ্চা দেখিনি। তাহলে এতোগুলো ইদুরের বাচ্চা এলো কোথা থেকে?

এ প্রশ্নের উত্তর আজও আমাদের কাছে রহস্য।

আম্মু কিছুটা সমাধান দিয়েছেন। তা হলো, আম্মু যখন চায়ের কাপগুলো সাজিয়ে আমাদেরকে খুজছিলেন তখন মনে হয় (মনের ধারণা) ঘরের (মাটির ঘর) সিলিং থেকে চায়ের কাপ ও ট্রে-র ওপর ইদুরের বাচ্চা পড়েছিল। তারপর নানু চা এগিয়ে দিয়েছিলেন।

নানু চোখে একটু কম দেখেন এ জন্য ইদুরের বাচ্চাগুলো দেখতে পাননি।

যাহোক, ঘটনাটি আজও আমাদের কাছে রহস্যময়। এই ঘটনার পর তিনজন মিস্ত্রি আমাদের বাড়িতে আর চা খাননি।

দেবগ্রাম, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে

টি মেড বাই কালোজিরা

– কাজী পারভেজ শাহরিয়ার

কোনো এক শনিবারের বিকেল। বাসায় বসে ডুগ্রে স্কট আর ড্রউ ব্যারিমুর অভিনীত *এভার আফটার* সিনেমা দেখছিলাম আমরা। আমরা মানে আমি আর আমার দুই বোন নিশি ও দোলা। হঠাৎই হাজির হলেন আমাদের ছোট ফুপা এবং সেজচাচা। আসলে হঠাৎ নয়, A শিফট ডিউটি শেষে প্রায়ই ওনারা আসেন আমাদের বাসায় একটু আড্ডা, কয়েক প্রস্থ লাল চা কিছু ঝালমুড়ির লোভে।

ছোট ফুপা অভ্যাসবশে ঘরে ঢুকেই স্বগতোক্তি করলেন, শাশুড়ি কি একটু চা-টায়ের আয়োজন করবে?

নিশিকে তিনি বরাবর শাশুড়ি বলেই ডাকেন।

নিশি রান্না ঘরে যাওয়ার আগে আমাকে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, সম্ভবত কিছু সময় সিনেমাটি বন্ধ রাখার কথা।

কিন্তু সেজচাচা এমন একটা কথা বলে ফেললেন, নিশি তার কথা শুরুই করতে পারলো না।

ভদ্রলোক যতোটুকু বললেন আর আমরা যতোটুকু শুনলাম তা হলো, তিনি কাউকে উদ্দেশ্য করে সম্ভবত নিশিকেই বললেন, তিনি কালোজিরা দিয়ে বানানো চা ঠিক পছন্দ করেন না।

কথাটা আমার কানে কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকলো। ঘটনা বুঝতে না পেরে তাকালাম চাচার দিকে। দেখলাম তার চোখ থেকে শুরু হওয়া হাসিটা প্রশ্রয় আর দুষ্টামিতে ভরা। কিছুই বুঝলাম না।

তাকালাম নিশির দিকে। আমার শ্যামলা রঙয়ের বোনটার লজ্জাবনত চোখের দিকে তাকাতেই ঘটনা আর বেখাপ্পা থাকলো না, মিলে গেল খাপের খাপ।

দুই সেকেন্ড পরেই শোনা গেল প্রচণ্ড হাসির বিস্ফোরণ এবং দেখা গেল নিশির দ্রুতবেগে পলায়ন।

ঘটনাটা কম বেশি আঠারো ঘণ্টা আগের অর্থাৎ শুক্রবার রাতের। বিটিভির থার্ড ক্লাস অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে আমার বাবার মনে হলো একটু চা হলে মন্দ হতো না। তৃষ্ণার্ত পিতার কাতর অনুরোধে নিশিকে ছুটতে হলো রান্নাঘরের দিকে। ওর হাতে তখন সদ্য ইসুকৃত *আম আটির ভেপু।*

নিশি সাধারণত চা ভালোই বানায়। কিন্তু সেদিনকার চা মুখে দিয়েই আমার বাবার চোখ চড়ক গাছ। অতঃপর মায়ের প্রতি মৃদু অভিযোগ, নিশির প্রতি মিষ্টি ভর্ৎসনা আর আমাদের প্রচণ্ড হাসির উদগীরণ।

কেন? আমার লক্ষ্মী পাগলি বোনটার মনোযোগ তখন অপু আর দুর্গাতে এতোটাই মগ্ন যে, ও খেয়ালই করেনি গরম পানিতে চাপাতার বদলে কালোজিরা দিয়েছে।

ঘটনাটার সমাপ্তি এখানেই টানা যেতো। কিন্তু সেটা হলো না। পরদিন বাবা তার বসকে ঘটনাটা বললেন।

এই বস ভদ্রলোক আবার বেশ খানিকটা আড্ডাবাজ। ফলে কথাটা একান–ওকান হতে হতে বেশ পপুলারিটি পেয়ে গেল।

নিশি পরিচিতি পেল তার বিখ্যাত কালোজিরা চায়ের রেসিপির জন্য। আর আমরা পেলাম মাঝে মধ্যে জাবর কাটার মতো মিষ্টি একটা স্মৃতি।

এই একঘেয়ে নিরানন্দ সংসারে এটুকুর মূল্যই বা কম কি!

যশোর থেকে
p_shahriar@yahoo.com

বাজিতে মৃত্যু

– মোহাম্মদ হযরত আলী

ছেলেবেলায় আমি আর ভাইয়া বিকেলের অবসরে বংশী নদীর পাড়ে বসে মজার একটি খেলা খেলতাম। খেলার শর্ত অনুযায়ী বংশী বৃজের ওপর দিয়ে চলাচলকারী প্রতিটি যানবাহনের মালিক হতাম আমি ও ভাইয়া।

বৃজের ওপর দিয়ে ঢাকাগামী প্রতিটি যানবাহনের মালিক হতাম আমি। ভাইয়া মালিক হতেন আরিচাগামী যানবাহনগুলোর। গণনায় সূক্ষ্ম কারচুপির আশংকায় পৃথক দুটি খাতায় প্রতিটি যানবাহনের সংখ্যা আমরা উভয়ে উভয়কে অবহিত করে যথাযথভাবে লিখে রাখতাম।

উভয়ের সম্মতিতে (খেলার সর্বোচ্চ সময় মাগরিবের আজান) খেলা যখন শেষ হতো তখন যানবাহনের সংখ্যার জের টানতাম। প্রায় দিনই ভাইয়ার চেয়ে আমি বেশি যানবাহনের মালিক হতাম। তখন গর্ব করে বলতাম, ভাইয়া, আমি তোমার চেয়ে বেশি যানবাহনের মালিক। আমি বেশি ধনী।

আমার কথায় ভাইয়া উত্তেজিত হয়ে আমাকে রেখে বাড়ি ফেরার পথে বলতেন, দেখিস আগামীকাল তোর চেয়ে বেশি গাড়ির মালিক হবো।

আমাদের কথোপকথনে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতো সালামের দোকানের হোটেল বয় আশরাফ। সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতো, ভাইজান, *বেশি ধনী হয়েন না। দুনিয়াতে যার সম্পদ যতো বেশি, আখেরাতে তার হিসাব ততো কঠিন হবে।*

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আশরাফের বক্তব্যকে বিবেচনা করে তার কথার প্রতি উত্তর করতাম না। নদীর পাড়ে আমরা যেখানে বসে যানবাহন গুণতাম, আশরাফ প্রতিদিন বিকেলে সেখানে এসে গোসল করতো।

একদিন স্কুল থেকে বাসায় ফিরে শুনলাম, আশরাফ এক ঢোকে এক কাপ গরম চা গিলে খেয়ে এখন মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে।

আমি ও ভাইয়া তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে আশরাফকে দেখতে হাসপাতালে গেলাম। হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম আশরাফ মারা গেছে। আমাদের আর কথা বলা হলো না আশরাফের সঙ্গে।

আশরাফ কেন এক ঢোকে এক কাপ গরম চা গিলে খেয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল, দুপুরে একজন হোটেলে ঢুকে হোটেলে বসে খেতে থাকা তার এক বন্ধুর কাছে একটা সমুচা খেতে চাইলে ওই বন্ধু সমুচা খেতে চাওয়া বন্ধুকে শর্ত দিয়ে বলেছিল শুধু সমুচা কেন, এই দোকান থেকে তোর যা খুশি, যতো খুশি খাবি, দাম দেবো আমি। তুই যদি এক কাপ গরম চা এক ঢোকে গিলে খেতে পারিস।

একটা সমুচা খাওয়ানোর বিপরীতে বন্ধুর দেয়া গরম চা খাওয়ার শর্তে সমুচা খেতে চাওয়া বন্ধুটি রাগান্বিত হয়ে বললো, আমি তোকে এক হাজার টাকা দেবো, যদি তুই এক কাপ গরম চা, এক ঢোকে গিলে খেতে পারিস। বাকি নয়, এই নে নগদ এক হাজার টাকা।

দুই বন্ধুর এক কাপ গরম চা গিলে খাওয়ার বাজিটি এক পর্যায়ে হোটেলে উপস্থিত সবার মাঝে উন্মুক্ত করা হলে আশরাফ এক কাপ গরম চা এক ঢোকে গিলে খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

বিস্মিত উপস্থিত সবাই আশরাফকে এক হাজার টাকা দেয়। শর্ত অনুযায়ী আশরাফ এক কাপ গরম চা এক ঢোকে গিলে খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

চার বছর আগে আশরাফের বাবা আশরাফের মাকে রেখে দ্বিতীয় বিয়ে করে নতুন বৌকে নিয়ে সংসার করেন। সংসারের হাল ধরতে কিশোর আশরাফ পড়াশোনা বাদ দিয়ে সালামের হোটেলে তিন বেলা খাওয়া সুবিধাসহ দৈনিক ত্রিশ টাকা বেতনে হোটেল বয়ের কাজ করতো।

আশরাফের এসএসসি পরীক্ষার্থী বোনটি আশরাফের মৃতদেহ বুকে চেপে ধরে বিলাপ করে বলছে, ভাইয়া, আমি আর তোর কাছে কখনো ফরম ফিল আপের টাকা চাইবো না। আমি আর পরীক্ষা দেবো না। শুধু তুই রাগ করিস না। তুই আমাদের ছেড়ে যাস না।

আশরাফের বোনের কান্নায় আশরাফ আর জীবিত হয়নি। তবে উপস্থিত সকলের চোখে অশ্রুধারা বয়ে গিয়েছিল।

জয়পাড়া, দোহার, ঢাকা থেকে

সমাচার

– জাফর আহমদ আকাশ

আমরা কয়েকজন বন্ধু যেমন আরজু, রহমান, সাইফুল, সেলু ছুটি পেলেই এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি বিভিন্ন স্থানে। কখনো লালবাগের কেল্লায়। কখনো বা সংসদ ভবন, তবে বেশির ভাগ সময়ে টিএসসি-তে যাওয়া পড়ে। কর্মব্যস্ত এই শহরে কাজ আর কাজ করে, সবাই যেন যন্ত্র হয়ে যাচ্ছি। তাই সপ্তাহের একটি দিন সবাই মিলে আড্ডায় মেতে উঠি।

সবাই মিলে বিকেলবেলা চলে গেলাম চারুকলায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে এক সময় চলে এলাম টিএসসিতে। টিএসসি-র মাঠে গোলাকারভাবে বসে মেতে উঠলাম বিভিন্ন কথাবার্তায়। বাদাম বিক্রেতার কাছ থেকে বাদাম, ঝালবুট কিনে নিলাম। বাদাম আর ঝালবুট খাওয়ার ফাকে চললো কথাবার্তা। এক সময় তাও ফুরিয়ে এলো। এক ছেলে দৌড়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো, চা লাগবে আপনাদের?

সাইফুল বললো, লাগবে মানে! তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়।

রহমান বলে উঠলো! চা ছাড়া আড্ডা জমে নাকি, এই ছেলে চায়ের সঙ্গে দুইটা বেনসন সিগারেট নিয়ে আসবি।

যথাসময়ে ছেলেটা চা নিয়ে এলে সবাই চা নিলাম।

সেলুর একটা বদঅভ্যাস আছে সেটা হলো, সব সময় সে চা খাবে পিরিচে ঢেলে। অভ্যাস অনুযায়ী সেলু পিরিচে চা ঢেলে মুখে দেবে এমন সময় ঝড়ের গতিতে একটি মেয়ে সেলুর সামনে দাড়িয়ে বললো, এক্সকিউজ মি!

সেলু মেয়েটির দিকে তাকাতেই পিরিচের চা পড়ে গেল। পড়বি তো পড় একেবারে সেলুর রাইফেলের ওপর। আর যায় কোথায়! যন্ত্রণার চিৎকার দিয়ে উঠলো সেলু, ও মাগো বলে।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

মেয়েটিও হেসে ফেললো। তারপর হাসি থামিয়ে বললো, আপনাদের মাঝে কার নাম আকাশ?

দাড়িয়ে বললাম, জি বলুন, আমিই আকাশ।

সরি, আমার আকাশের সঙ্গে আপনার কোনো মিল নেই। বলেই মেয়েটি চলে গেল।

তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে গেয়ে উঠলাম, ও আকাশ, *ও আকাশ, তুমি কোথায়?*

সেলুর অবস্থা দেখে রহমান বলে উঠলো, *এক মাচ্ছার শালা আদমি কো হিজড়া বানা দিয়া।*

আরজু টিপ্পনি কেটে বলে উঠলো, এখানে এটা হবে না।

তাহলে কি হবে?

এখানে হবে, *এক কাপ চা সেলু কো হিজড়া বানা দিয়া।*

সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলাম। এখনো যে কোনো চায়ের আড্ডায় সেলুকে এটা বলে সবাই খেপাই।

ইমামগঞ্জ, ঢাকা থেকে

হাতছানি

– ডি.এম হাসু

সালটা সঠিক মনে নেই। ১৯৪৩ কি ১৯৪৪ হবে। গণ্ডগ্রামের ক্লাস ফাইভের ছাত্র। আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল স্কুল। পার্শ্ববর্তী দুই চার গ্রামে স্কুল না থাকার কারণে দূর–দূরান্ত থেকে আসা কিছু ছেলেমেয়ে এখানে এসে পড়াশোনা করতো। ক্লাস ফাইভে ওঠার পর ক্লাসে অস্বাভাবিকভাবে ছাত্রসংখ্যা কমে গেল। আমরা মাত্র বিশ পচিশজন ছাত্র নিয়মিত ক্লাস করতাম। ক্লাসে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না বললেই চলে। কিন্তু ক্লাস ফাইভে প্রথম পরীক্ষা হওয়ার পর লক্ষণীয় বিষয় হলো, ক্লাসে আমার একজন ভালো প্রতিদ্বন্দ্বীর উথান হয়েছে।

আগ্রহ নিয়ে প্রথমে আমিই তাকে নাম, ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলাম। জানতে পারলাম তার নাম রোকন। সে শহরে লেখাপড়া করতো, বাবা মা গ্রামে চলে আসাতে এখন সে গ্রামেই লেখাপড়া করবে।

প্রথমে কিছুটা অবাক হলাম, যে ছেলের শারীরিক কাঠামো এতো দুর্বল সে কি করে এতো ভালো ছাত্র হয়, পরে অবশ্য মেনে নিতে হলো সত্যিই সে মেধাবী।

শ্যামল বরণ ছেলেটি ছিল খুবই লাজুক আর ক্লাসে উপস্থিতি ছিল অতি নগন্য। এক সময় আমিই বন্ধুত্বের হাত বাড়ালাম। তারও সায় পেলাম। ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগলো। মাঝে মধ্যে সে আমাকে আমন্ত্রণ জানাতো তাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য। কি কারণে যেন সংকোচ বোধ করতাম। তাই যাওয়া হতো না।

একদিন আব্বা আর আমি আমাদের পাসের রূপসা বাজারে রওনা হলাম। রোকনদের বাড়ির সামনে দিয়ে বাজারে যেতে হতো। পথেই তার সঙ্গে দেখা। রোকন অনুরোধ জানালো তাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আব্বা সঙ্গে থাকার কারণে কিছুই বলতে পারছি না। আব্বাকে খুব ভয় পেতাম। রোকন ব্যাপারটি বুঝতে পেরে অত্যন্ত বিনীতভাবে আব্বাকে আমন্ত্রণ জানালো তাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য। আব্বা তো অবাক, বলে কি ছেলে! আব্বা অবশেষে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

রোকন অত্যন্ত সাবলীলভাবে তার পরিচয় দিল।

শেষে আব্বা তাকে এই বলে আশ্বস্ত করলো, বাজার থেকে আসার সময় তাদের বাড়ি হয়ে যাবেন। রোকনও বিনা বাক্যে রাজি হলো।

ভাবলাম বাজার থেকে আসার সময় রোকনকে হয়তো দেখা যাবে না আর আমাদেরও যাওয়া হবে না। কিন্তু আমাদের অবাক করে বাজার থেকে আসার সময় দেখলাম ও আমাদের জন্য বসে আছে।

আব্বাও বললেন, চল।

আমরা দুজন রোকনের সঙ্গে যখন তাদের ঘরে পৌছালাম, দেখলাম তার মা এবং বাবা দুজনই আমাদের জন্য অপেক্ষায় আছেন। আমাদেরকে পেয়ে মনে হলো তারা অত্যন্ত খুশি। কিছুক্ষণ কথা বলার পর আমাদের জন্য নাশতা আনা হলো নোনতা বিস্কিট, সঙ্গে গরম পানির মতো কি যেন।

আব্বাকে বললাম, এটা কি?

তিনি বললেন, কেন, তুমি জানো না এটা কি? এটাই হচ্ছে চা।

আব্বা আমাকে কাপ থেকে পিরিচে ঢেলে দিলেন। সঙ্গে সাবধান করে দিলেন গরম বলে।

পান করার পর খুব ভালো লাগলো। দুই চার দিন ধরে এর স্বাদ লেগে ছিল মুখে।

এভাবে চা খাওয়া শুরু। এরপর সময় পেলে চলে যেতাম রোকনদের বাড়ি শুধু চা খাওয়ার লোভে। রোকনের মা অর্থাৎ যাকে আমি খালাম্মা বলে ডাকতাম তিনি এতো ভালো চা তৈরি করতেন যে, এলাকায় তার চায়ের খুব সুখ্যাতি ছিল। পাড়ার এমন কোনো লোক নেই যে তার হাতের চা খাননি। দেখতাম ছোট্ট একটি ফ্লাস্ক পড়ে থাকতো টেবিলের কোণায়, সেখান থেকে যে যার ইচ্ছা মতো চা খেতো। তাদের বাড়িতে গেলে আমিও নিজ হাতে চা খেতাম। এরপর এই পরিবারের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ হয়েছি, কখনো মনে হয়নি এরা আমার অন্য কেউ।

কিন্তু ১৯৬০-এর ৭ এপৃলে প্রচণ্ড হোচট খেলাম। মরণব্যধি ক্যান্সার রোকনকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেল। তাদের সংসারেও কেমন জানি একটা স্থবিরতা এসে গেল। তারপরই সম্পর্ক শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু না। শেষ হয়নি। এরপর তাদের পরিবারের আরো গভীরে পৌছালাম।

রোকন ছিল তাদের বাবা মায়ের প্রথম ছেলে সন্তান। তার আরো দুটি বোন ছিল। দুই বোনই ছিল অসম্ভব রূপসী। রোকনের মৃত্যুর আগেই সুহার সঙ্গে একটু-আধটু সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যদিও তা রোকন জানতো এবং সম্ভবত তার সমর্থনও ছিল। রোকনের মৃত্যুর পর তা অনেক গভীরে পৌছালো। এক সময় দুই পরিবারের সম্মতিতেই আমাদের প্রণয় হলো, আবদ্ধ হলাম বিয়ের বন্ধনে।

সুহাও ছিল তার মায়ের মতো। পরিতৃপ্ত হতাম তার বানানো এক কাপ চা খেয়ে।

এরপর সুহাও হারিয়ে গেল আমার কাছ থেকে। রেখে গেল একটি মাত্র স্মৃতি আন্নি। অনেক দুঃখ-কষ্টের মাঝে তার মানুষ হওয়া। যখন সে মেডিকাল থেকে বের হলো, বিয়ে দিলাম আমারই পছন্দ করা ছেলে আনুর কাছে। দুই বছর পর তাদের কোল জুড়ে চাদমুখ। আনু-আন্নির চেয়েও বেশি খুশি আমি।

সবাই মিলে আমাকে দায়িত্ব দিল নাম রাখার জন্য। দুই দিন ভেবে মনস্থির করলাম কি নাম রাখা যায়। অবশেষে তার নামেই নাম রাখলাম যে পৃথিবীতে কিছু মুহূর্তের জন্য এসে আমার জীবনকে ধন্য করে গেছে। সুহা, বর্তমানে তার বয়স চোদ্দ, ঠিক যেন আমার ষাট বছরের আগের সেই সুহা। তার মতোই দীপ্তিময়, চঞ্চল। জন্মের পর থেকে সে আমার বাড়িতেই থাকে। আমার ঘরের প্রতিটি কাজেই তার হাতের ছাপ বিদ্যমান।

বয়সের ভারে জর্জরিত আমি ডায়াবেটিস, প্রেশার থেকে শুরু করে যাবতীয় রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছি প্রতিদিন। বিছানা নিয়েছি আরো আগে। সারা দিন মনটা খারাপ থাকে। বিকেলে সুহা যখন স্কুল থেকে ফেরে, ফিরে পাই আমার হারানো সেই প্রাণশক্তি। সুহাও আমাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। বিকেলে আমি আর সুহা ছাদে বসে গল্প করি কিংবা বই পড়ি।

সে আমার কাছে শুনতে চায় মহাযুদ্ধের গল্প, বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের স্বাধীনতার গল্প। কিংবা আমি তার কাছে শুনি ক্লাসের বান্ধবীদের আবেগ, উচ্ছ্বাস, ভালো লাগার গল্প।

তবে এতো কিছুর পরও একটা জায়গা আমাকে সব সময় ভাবায়, সুহার হাতের বানানো চা ঠিক যেন ষাট দশকের সেই সুহার চেয়েও ভালো। আমার বন্ধু-বান্ধবরা যখন চা খেয়ে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলে সত্যিই

তুই ভাগ্যবান, সুহার হাতের চা না খেলে বুঝতাম না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি এককাপ চা টেবিলের ওপর। চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে যখন চুমুক দিই ফিরে যাই আমি সূদুর অতীতে যেখানে সুহা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

বোয়াডার মৌলভীবাজার, রায়পুর, লক্ষীপুর থেকে

শ্যালিকা যখন নেত্রী

– এসএমজেড আবেদীন

ওরা ছয়জন সদলবলে এলো। কমান্ডো স্টাইলে আমাকে ঘিরে ধরলো।

ভাবনায় ছেদ পড়লো আমার। কি চাই তোমাদের?

চাদা মাত্র দুইশ টাকা দিতে হবে এক্ষুণি, না দিলে খবর আছে। সন্ত্রাসী কায়দায় বাজখাই কণ্ঠে বললো যে বালিকা, সম্ভবত এই এদের দলনেত্রী। দলে আরেকজন সিনিয়র বালিকা থাকা সত্ত্বেও সে নেত্রী হতে পারেনি, মনে হয় চাপাতে জোর কম।

দলনেত্রী আমার একমাত্র শ্যালিকা। এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে এবার। কলেজে যাবে যাবে একটা ভাব নিয়ে সে চলাচল করে। বাকি চারজন শ্যালক, মোটা–তাজায় বেশ। কিন্তু কথাবার্তায় হাবাহাবা। তাই সিনিয়র হয়েও জুনিয়র নেত্রীর চামচামি করে। দলনেত্রীকে এক নজর দেখলাম, মাস্তানি পোশাক–পরিচ্ছদ, গায়ে চোখে কালো সানগ্লাস, মাথায় হ্যাট। দেখে তাকে একশ ভাগ গুণ্ডা গুন্ডা মনে হচ্ছে। দেখতে বেশ লাগছে।

নিমন্ত্রণ পেয়ে শ্বশুরালয়ে এসেছি তাদের একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে। শ্যালক–শালিকার দল মজা করার জন্য সং সেজে যেভাবে আমার কাছে এসেছে তা তো ভালোই। তবে টাকা–পয়সার ব্যাপারটাতে আমার আপত্তি।

রস করে কথা পড়লাম। প্রিয় ছোট গিন্নি, চাদার টাকায় কি হবে শুনি?

আমরা একটা চা চক্রের আয়োজন করেছি। আমন্ত্রিত অতিথিরা সবাই সেখানে থাকবেন। আমরা আপনাকে সেখানে প্রধান অতিথি করেছি। কতো বড় সম্মান আপনাকে দিয়েছি বুঝুন, সে তুলনায় টাকাটা সামান্য মাত্র। মালটা তাড়াতাড়ি ছাড়ুন, আরো কয়েকজনের কাছে যেতে হবে বলেই নেত্রী হাত পাতলো।

প্রিয় নেত্রী, আমি তোমাদের সম্মানিত অতিথি। এভাবে বাড়িতে ডেকে এনে জোরপূর্বক টাকা আদায় করা কি শোভন কাজ।

নেত্রীও ছাড়ার পাত্রী নয়।

আপনি আমাদের প্রাণপ্রিয় দুলাভাই, আমরাও আপনার অত্যন্ত আদরের ও স্নেহের। আমাদের সকল দাবি–দাওয়া তো আপনার কাছেই। নাকি রাস্তার গন্ডমূর্খদের কাছে যাবো?

বাহ! ভালো চাপাবাজ হয়েছো। ভবিষ্যতে বড়সড়ো আকারের নেত্রী হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। কিছুটা টিটকারির স্বরে বললাম।

নেত্রী খপ করে কথাটা ধরলো।

আরে নেত্রী তো আমরাই হবো। দেশের অবস্থা দেখছেন না? আমাদের প্রধানমন্ত্রী নারী, বিরোধী দলের প্রধান তিনিও নারী। আপনারা পুরুষরা ওনাদের পেছনে ওঠ–বস করেন, ঘুর ঘুর করেন। আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত।

ভাবছি এ মেয়ের সঙ্গে কথায় পারা যাবে না। কথা আর না বাড়িয়ে একশ টাকায় একটি নোট তার দিকে এগিয়ে দিলাম।

সে প্রত্যাখ্যান করলো।

ছিঃ ছিঃ, এ যে ফকিরের ভিক্ষা। আপনি একজন বিএসসি শিক্ষক হয়ে এটা দিতে পারলেন? ছাত্র পড়িয়ে টাকা তো কম কামান না? দুইশর নিচে হবে না।

দিচ্ছি।

নিচ্ছে না।

বোঝাচ্ছি। বুঝছে না।

মহা ঠেলা ধাক্কায় পড়লাম।

ইতিমধ্যে সেখানে আমার অরিজিনাল গিন্নি এসে হাজির। শক্ত কথায় ধমক কষলো নেত্রীকে। ফাজলামো পাইছিস, তাই না? চা বানাবি পনেরো বিশ কাপ, তিন চার প্যাকেট চানাচুর, বড় জোর দুইশ টাকা খরচ হবে। চাদা আদায় করেছিস হাজার খানেক। ডাকাতি ব্যবসা শুরু করেছিস। দুলাভাইকে পেয়েছো একটা ছাগল যে, যা চাইবে তা-ই দেবে বলেই থাপ্পড় মারতে গেল।

নিরুপায় হয়েই নেত্রী আপাতত একশ টাকা নিয়েই প্রস্থান করলো। যেতে যেতে বলে গেল, এর বদলা নেবো দুলাভাই।

সন্ধ্যার পর তাদের অনুষ্ঠান শুরু হলো। চা চক্রের অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, গান, কৌতুক সবই হলো। প্রধান অতিথি আমি নাতিদীর্ঘ একটি বক্তব্যও আমাকে দিতে হলো। হালকা-পাতলা নাশতা শেষে চা পান পর্ব শুরু হলো। আমাকে একটি বিশেষ ধরনের কাপে চা দেয়া হয়েছে। ভাবলাম, এটা বোধহয় প্রধান অতিথির জন্য বিশেষ সম্মান।

দেখলাম সবাই চা পানে মগ্ন। বিশেষ একটা আয়েশে সবাই খাচ্ছে। অনুষ্ঠানটি তো চা চক্রের। তাই সবাই একটা ভাব নিয়ে চা খাচ্ছে। আমার কাপে ঠোট ছোয়ালাম। প্রথম, দ্বিতীয় চুমুকে টের না পেলেও তৃতীয় চুমুকে একশ ভাগ টের পেলাম এটা ঝাল চা। চতুর্থ চুমুকে শুরু হলো আমার হাচি, কাশি এবং গলায় জ্বলুনি। হাচি, কাশি, আমার সমান তালে চলছে। উঠে দাড়ালাম।

শ্যালক-শালিকার দল খিলখিল করে হেসে উঠলো। আমার একমাত্র পাচ বছরের ছেলে নাফিসও সে হাসিতে যোগ দিল।

গিন্নি আমার ছুটে এলো। কি হলো তোমার, অমন করছো কেন?

হাপাতে হাপাতে বললাম, তোমার বোন চায়ে মরিচ দিয়েছে, গলাটা আমার জ্বলে গেল।

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই আমার নেত্রী শ্যালিকা শরবতের গ্লাস নিয়ে সেখানে হাজির।

দুলাভাই, বলছিলাম না বদলা নেবো, নিতে পেরেছি তো? এবার ঠাণ্ডা শরবতটা খান, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সন্দেহের চোখে বললাম, তোকে আর বিশ্বাস করি না। এটাতে আবার কি মিশিয়েছিস কে জানে।

মিনতি করে বললো, না দুলাভাই, এটা আসলেই খাটি মিষ্টি শরবত, ভেজাল নেই। জোর করে আমার ঠোটের কাছে সে শরবতের গ্লাসটি চেপে ধরলো।

তখন আমার যা অবস্থা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। ঢক ঢক করে শেষ করলাম ঠান্ডা পানীয়টা। বেশ লাগলো।

হাসির একটা রোল পড়ে গেল সবার মাঝে।

শান্ত হয়ে বসলাম। বাকা চোখে নেত্রীর দিকে চেয়ে বললাম, সুযোগ পেলে এর শোধ নেবো। মনে রাখিস।

মুখে ভেংচি কেটে নেত্রী জবাব দিল, থাকুন অপেক্ষায়।

মেলান্দহ, জামালপুর থেকে

কালো দাগ

– বীণা

তখন সবেমাত্র এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। পরীক্ষার পর অফুরন্ত সময়। জীবনে সময় কাটানো যে একটা ব্যাপার হয়ে দাড়াবে তা কখনো ভাবিনি।

এতো দিন পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তার উপর আমার বড় দুই বোন ঢাকায় কোচিং করতে যাওয়ায় আমি আরো একা হয়ে গিয়েছিলাম। আগে আপুদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি, মারামারি করে খুব দ্রুত সময় পার হয়ে যেতো।

আপুরা চলে যাওয়ায় আমি খুব একা হয়ে যাই। এখান থেকে ওখানে ঘোরাঘুরি করে আর টিভি দেখে খুব একঘেয়ে সময় কাটাচ্ছিলাম। ঠিক এমনই এক সময় আমার মামা তার একমাত্র ছেলে নয়নকে নিয়ে আমাদের বাসায় এসে হাজির। গ্রামে তার একদম পড়াশোনা হচ্ছে না। তাই মামা তাকে শহরে রেখে পড়াশোনার করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নয়নকে আমাদের বাসায় রাখতে আমার আব্বা–আম্মা রাজি হয়ে গেলেন।

নয়নকে ক্লাস সিক্সে ভর্তি করে দিয়ে মামা চলে গেলেন। যাবার আগে অবশ্য মামা নয়নের দুষ্টুমির ইতিহাস বলে গেলেন কিভাবে নয়ন স্কুল ফাকি দিয়ে সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ায় আর দলবল নিয়ে খেলতে গিয়ে মারামারি করে বাড়ি ফেরে।

নয়নের চেহারা দেখে সে রকম কখনোই আমার মনে হতো না। বরং তার স্নিগ্ধ চেহারার দিকে তাকালে আমার মনে হতো এ রকম শান্ত ছেলে বুঝি দুনিয়ায় একটাও নেই। কিন্তু দুই দিন পরেই বুঝতে পারলাম মামা নয়ন সম্পর্কে একেবারে বাড়িয়ে বলেননি।

ইচ্ছা করেই নয়নের সঙ্গে নানান রকম দুষ্টুমি করতাম। যেমন চা নিয়ে নয়নের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতাম কার চা খাওয়া আগে শেষ হয়। এদিকে আমি চা দেয়ার আগেই আমার চাটা একটু ঠাণ্ডা করে নিয়ে নয়নকে একেবারে আগুন গরম চা দিতাম। ফলে নয়ন প্রতিদিনই আমার সঙ্গে কমপিটিশনে হেরে যেতো আর জিভ পুড়িয়ে একাকার করে ফেলতো।

কিভাবে জানি ব্যাপারটা এক সময় নয়ন ধরে ফেলে। এভাবেই যখন একদিন নয়নের জন্য আগুন গরম চা–টা ডান হাতে আর আমার প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া চা বাম হাতে নিয়ে আসছিলাম ঠিক সে সময় নয়ন তার কৃকেট খেলার বলটা ছুড়ে মারে। ফলে কাপ–পিরিচ ভেঙে সম্পূর্ণ চা আমার হাতের ওপর পড়ে।

আমার চিৎকারে আব্বা–আম্মা, সেই সঙ্গে নয়নও ছুটে আসে। আব্বা–আম্মা মনে করেন, খেলতে গিয়ে হঠাৎ করেই বলটা আমার হাতে এসে লেগেছে। কিন্তু আমি ঠিকই বুঝতে পারি ব্যাপারটা আসলে কি।

এরপর মামা যখন আমাদের বাসায় আসেন, আমার হাতের কালো দাগ মামাকে দেখিয়ে সব ঘটনা খুলে বলি। মামা নয়নকে কিছু উত্তম মাধ্যম দেন আর আব্বা–আম্মা বকা দেন আমাকে, কেন আমি বড় হয়েও নয়নের সঙ্গে ফাজলামি করতে যাই।

নয়ন এখন আর আমাদের বাসায় থাকে না। এসএসসি পাস করে সে রাজশাহী নিউ ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু আমার হাতের সেই কালো দাগ এখনো আছে। নয়ন চলে যাবার পর আবার আগের মতো একা হয়ে যাই। কারণ আমার বড় দুই আপু ঢাকা ভর্তি হয়েছেন আর আমি সিরাজগঞ্জেই আছি।

আমার কথা নয়নের মনে পড়ে কি না জানি না। কিন্তু তার কথা আমার খুব মনে পড়ে। বিশেষ করে হাতের কালো দাগটার দিকে তাকালে সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়।

হোসেনপুর, সিরাজগঞ্জ থেকে

অবশেষে

– সোনিয়া

তখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছি। লম্বা ছুটি। কলেজ নেই। বন্ধু–বান্ধবের সঙ্গে দেখা নেই। কি করবো ভাবছি। এর মধ্যে আব্বার পরামর্শে পোশাক তৈরির ওপর ট্রেনিং নেয়ার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদফতরে ভর্তি হলাম।

আমি ছাড়া আরো চব্বিশজন ভর্তি হলো। এর মধ্যে কল্যাণী নামের এক মেয়ে ভর্তি হলো। তার চেহারা নাকি হুবহু আমার মতো। অনেকে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতো আমরা যমজ বোন কি না? আরেকটা মেয়ে ছিল নাম জাফরীন। এ দুজনের সঙ্গে আমার দুদিনেই খুব ভালো সম্পর্ক হয়ে গেল।

একদিন দেখি একটি ছেলে অফিসের দিকে আসছে। আমরা দুজনেই তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। লম্বা প্রায় ছয় ফিটের মতো। মাথায় হালকা কোকড়া চুল। গায়ের রঙ হলুদ বর্ণ। বিশাল মোচওয়ালা। ছেলেদের মোচ এমনিতেই ভালো লাগে না। কিন্তু তাকে দেখে মোটেই বেমানান মনে হচ্ছে না। বরং না থাকলেই মনে হয় খারাপ লাগতো।

কল্যাণী বললো, দেখো, রাজপুত্র আসছে।

পরে জানলাম সে যুব উন্নয়নে টাইপ শিখতে ভর্তি হয়েছে। ক্লাস শেষে সে অফিস থেকে বের হয়ে কাছেই এক চায়ের দোকানে গিয়ে বসলো।

আমি এমনিতে চা খাই না। কিন্তু তার দেখাদেখি আমরাও চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। যেহেতু চায়ের দোকান, তাই চা খেতে হলো।

পর দিন আবার।

তারপর আবার।

এভাবে চলতে থাকলো চা খাওয়া। এক সময় বাড়িতেও শুরু হলো চা খাওয়া। ব্যাপারটা মোটামুটি অভ্যাসে পরিণত হলো। কিন্তু যতোই তার পথের দিকে তাকিয়ে থাকি কিংবা এক সঙ্গে বসে চা খাই না কেন, কাজের কাজ হচ্ছে না। মানে কথা বলা হচ্ছে না।

কল্যাণী একদিন বললো, ওনার নাম জিজ্ঞাসা করা দরকার।

বললাম, তোমার দরকার থাকলে তুমি বলো।

সে বললো, আমি পারবো না, তুমি বলো।

এভাবে দুজনার ঠেলাঠেলিতে আরো দুই তিন দিন পার হলো।

শেষে একদিন বললাম, চলো আজ তার নাম শুনবোই। এই বলে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আমাদের ক্লাস শুরু হতো দশটায়, শেষ হতো একটায়। তার শুরু হতো বারোটায়।

কিছুক্ষণ পর দেখি সে আসছে। তার আসা দেখে আমরা অফিস থেকে বের হলাম। আমরা তিনজন ছিলাম – আমি, কল্যাণী আর জাফরিন।

জাফরিন ভয়ে আমাদের রেখে চলে গেল।

একটু পর সে যখন আমাদের কাছাকাছি এলো তখন আমরা দাড়িয়ে পড়লাম।

বললাম, শুনুন।

সে থমকে দাড়ালো এবং অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো যেন পৃথিবীর নবম আশ্চর্য দেখছে।

প্রথমে থমমত খেয়ে গিয়েছিলাম, পরে স্বাভাবিক হয়ে জানতে চাইলাম, আপনার নাম কি?

সে আমার দিকে বাকা চোখে তাকিয়ে বললো, নাম দিয়ে কাম কি?

আমি মোটামুটি সুন্দরী একটি মেয়ে। সেই ছোটবেলা থেকে এই পর্যন্ত দেখে এসেছি, ছেলেরা আমার পেছনে ঘুর ঘুর করে। এর-ওর মাধ্যমে আমি অনেকের অনেক চিঠি পেয়েছি। সেসব চিঠিতে ভালো লাগার কথা-ভালোবাসার কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখা থাকতো। আমার সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য অনেকে হ্যাংলার মতো আমার পেছনে ঘোরে।

আমার সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলতে পারে, কল্পনাও করতে পারি না। আমি হা হয়ে তার দিকে তাকালাম। সে তার প্রশ্ন নিয়ে আমার দিকে তাকিয়েই আছে।

অবশেষে কল্যাণী বললো, না এমনিতেই।

সে বললো, শাহজাহান বিশ্বাস, ডাক নাম শাজু। তারপর আবার বললো, নাম জানতে চাইলেন কেন বললেন না?

দ্বিতীয় দফা চমকে তার দিকে তাকালাম। কি নিষ্পাপ একখানা মুখ। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল ওই মুখ থেকে এমন কঠিন কথা বের হচ্ছে। তার প্রশ্ন শুনে যেন বোবা হয়ে গেলাম।

কল্যাণী আবার বললো, আপনাকে পরিচিত মনে হলো, তো তাই।

আচ্ছা বলে সে চলে গেল।

চামার কোথাকার। বলে তার গমন পথের দিকে একবারও না তাকিয়ে চলে এলাম। সেদিন বাড়িতে এসে আমি ভাত খাইনি। একজন মানুষ একজনের নাম জানতে চাইতেই পারে, তার জন্য তার সঙ্গে এমন আচরণ করতে হবে? এ কথা ভেবে ভেবে জীবনে প্রথমবারের মতো সেই দিন সারা রাত আমার ঘুম হয়নি।

যুব উন্নয়ন ছিল আমাদের মজার আড্ডাখানা। যতো রোদ হোক, বৃষ্টি হোক, যুব উন্নয়নে যাওয়া মিস করতাম না। সেই ঘটনার পর থেকে পর পর তিন দিন আমি যুব উন্নয়নে যাইনি। এর মধ্যে আব্বা ঢাকা থেকে আমার জন্য একটা ব্যাগ নিয়ে এলেন।

চতুর্থ দিন সেই ব্যাগ নিয়ে অফিসে গেলাম। কল্যাণী, জাফরিন সব আমাকে ঘিরে ধরলো আমার কি হয়েছে জানার জন্য।

এর মধ্যে আমাদের অফিসের পিওন আফজাল এসে আমাকে বললো, সোনিয়াআপা, আপনার ব্যাগ নাকি শাজুভাই কিনে দিয়েছে?

সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্যাগ ছুড়ে ফেলে দিলাম।

জাফরিন, কল্যাণী দুজনেই আমাকে বোঝাতে লাগলো, পাগলামি করো না। আর পিওনকে বললো, গিয়ে বল শাজুভাইয়ের সব শার্ট প্যান্ট নাকি সোনিয়ার কেনা।

এভাবে শুরু হলো ফাজলামো।

আমাদের পিওনটা প্রায়ই এসে বলতো, শাজুভাই চানাচুর খাবে টাকা দিতে বলেছে।

আবার বলতো, সোনিয়াআপা, শাজুভাই আপনাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছে।

আমার বান্ধবীরা তাকে অফিসে আসতে দেখলেই বলতো, তোমার রাজপুত্র আসছে। তার অভ্যাস অনুযায়ী প্রতিদিন অফিস শেষে সে চায়ের দোকানে যেতো। কিন্তু আমি ওই দোকান দূরে থাক, অন্য কোথাও, এমনকি বাড়িতেও আর চা খাই না। তার আসা-যাওয়ার পথের দিকে তাকানোর তো প্রশ্নই ওঠে না।

কিছুদিন পর আমাদের ট্রেনিং শেষ হলে আমরা যুব উন্নয়ন ছেড়ে চলে আসি। তার সঙ্গে আর খুব একটা দেখা-সাক্ষাৎ হয় না।

গল্পটা যদি এখানেই শেষ হতো তাহলে কেমন হতো জানি না। কিন্তু গল্পের শেষের অংশটা এমন :

শাজুর সঙ্গে এরপর আমার মাঝে মধ্যেই দেখা হতো। আমরা যেদিন প্রথম দেখা করতে বের হই সেদিন আমাদের দেখা হয়েছিল যুব উন্নয়নের পাশে সেই বিখ্যাত চায়ের দোকানে। ওখানে বসেই আবার চা খাওয়া হলো, অনেক কথা হলো। অনেক গল্প হলো। আমি যার কাছেই তার গল্প করতাম তার নামের জায়গায় *চামার* সম্বোধন করতাম।

পরবর্তীকালে দেখেছি এই চামার ভদ্রলোক হচ্ছে, এ পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর ভালো মানুষদের একজন। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই চামারের সঙ্গে দীর্ঘ চার বছর চুটিয়ে প্রেম করেছি। আর বর্তমানে আমরা দুজন বিয়ে করে মহা সুখে ঘর-সংসার করছি।

ফরিদপুর থেকে

একই দাম

– মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম

প্রায় তিন মাস পর ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। ম্যাগনোলিয়া এপার্টমেন্টের মহুয়া কম্পার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে এলো কল দেয়ার প্রায় আধা ঘণ্টা পরে। অন্যদিন সাধারণত এতো দেরি করে না।

শাবানা, কেমন আছো?

এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে সোজাসুজি চললো মিরপুর দশ নাম্বার গোল চক্করের দিকে।

বুঝতে পারলাম আমরা যাচ্ছি বহু পরিচিত জায়গায় ক্যাফে টোকিও-তে।

টেবিলের দুই পাশে দুইজন। দুই কাপ চা, অর্ডারটা ওই দিল।

বললাম, শুধু চা কেন?

সাড়া পেলাম না।

অন্যদিনের তুলনায় আজ ওকে কেন যেন বেশি সুন্দর লাগছে।

ওয়েটার ছেলেটা দুটো চা দিয়ে গেল।

এরপর অনেকক্ষণ কেটে গেল, কেউ কোনো কথা বলছি না।

হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে সে বললো, আজকে তোমার-আমার শেষ দেখা। আমিই এখন তোমাকে পছন্দ করি না।

আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। আমি এখন কাদবো, না হাসবো বুঝে উঠতে পারছি না। এতোদিন জানতাম, শুধু তার গণ্ডমূর্খ মামা আমাদের এই সম্পর্কে বাদ সেধেছেন। তবুও ভেঙে পড়েনি ও। একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। অথচ আজ...।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ও বললো, আমি অতীতে যা কিছু করেছি এবং যা কিছু বলেছি তা সবই মিথ্যা অভিনয়। এখন যা বলছি তাই সত্যি। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, খেয়ে নাও।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে গত আড়াই বছরে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মনে করতে চেষ্টা করলাম। আর্থিক অনটনের কারণে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মনোবিজ্ঞানে অনার্স করার পাশাপাশি ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে রোস্টার ডিউটির একটা চাকরি করছিলাম। ডিউটির কারণে সপ্তাহে তিন দিনের বেশি ক্লাস করা সম্ভব হয় না। সঙ্গে দুটো টিউশনিও আছে। কারণ শুধু নিজে চললেই হয় না, বাড়িতেও টাকা পাঠাতে হয়।

এতো কষ্টের মাঝেই ফার্স্ট ইয়ার পাস করে সেকেন্ড ইয়ারে উঠলাম। পরীক্ষায় সেকেন্ড ক্লাস মার্কস পেলাম।

চলছিল আমার যন্ত্রের মতো জীবন। মনে হচ্ছিল হয়তো আর পারবো না। ২০ মার্চ ২০০৩ সালে হঠাৎ ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। প্রস্তাবটা প্রথমে ওই দিয়েছিল। পেশায় সে ছিল সেবিকা। আমার সব কিছু জানার পরেও সে আমাকে খুব আপন করে নিয়েছিল। প্রায় প্রতিদিনই দেখা হতো দুজনের।

হঠাৎ করেই আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটের যোগ্যতায় একটা সরকারি চাকরি হয়ে গেল। ওর পরামর্শেই ইউনিভার্সিটির পাট চুকিয়ে পোস্টিং নিয়ে গেলাম কিশোরগঞ্জে। সেখান থেকেই প্রায় প্রতিদিন ফোনে যোগাযোগ করছিলাম। অন্তত মাসে দুই তিনবার দেখা করতে ঢাকায় আসতাম। ক্রমেই তার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে গেলাম। অনুভব করতাম, সেও প্রচণ্ড ভালোবাসে আমাকে।

একদিন মহাখালীতে ফাস্ট ফুডের দোকানে যাওয়ার সময় বলেছিলাম, আমার এতো অভাব-অনটন দেখে তুমি ভয় পাওনা?

উত্তরে সে বলেছিল, তোমার সঙ্গে আমি জাহান্নামেও থাকতে পারবো।

বাড়ি থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে একদিন ওকে বলেছিলাম, আমার যে অবস্থা তাতে তোমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারছি না।

উত্তরে সে বলেছিল, তুমি ছাড়া অন্য কোনো পুরুষকে আমার দেহ স্পর্শ করতে দেবো না।

ঈদের ছুটিতে দুজনেই বাড়িতে ছিলাম। ও খবর পাঠালো ওদের বাড়িতে দেখা করার জন্য।

ওদের বাড়িতে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় ছিল মাগরিবের আজানের পরে। ভালো বলছি এ জন্য যাতে অন্য কেউ দেখতে না পারে।

সন্ধ্যা সাতটা থেকে নয়টা পর্যন্ত ওর ঘরে বসে গল্প করার পর বলেছিলাম আমাকে এগিয়ে দাও যেতে হবে।

ওদের বাড়ির পাশে বিরাট ফাকা ফসলি জমি। হেমন্তের ফসল কাটা শেষ হয়েছে। সেই ফাকা জায়গায় আমার সঙ্গে ও কিছু দূর আসার পরে ওকে বুকে জড়িয়ে নিলাম। কয়েকটা চুমুও খেলাম। মেতে উঠতে চাইলাম তারুণ্যের উচ্ছলতায় আবেগী খেলায়।

ও শুধু বললো, আগেই সব মজা শেষ করে দিও না।

কপালে একটা চুমু খেয়ে ছেড়ে দিলাম।

বর্ষার সময় চারদিকে পানিতে থই থই করছিল। রাস্তার পাশেই একটা বাধা নৌকা দেখিয়ে বললাম, চলো নৌকায় করে তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাই।

উত্তরে সে বললো, সময় হলে তুমি না নিলেও আমি একাই তোমার বাড়িতে গিয়ে উঠবো।

গত ১০ মার্চ ওদের বাড়িতে গেলাম দেখা করার জন্য। মজা করার জন্য বললাম, আমার বিয়ে ঠিক। তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলো।

শুনেই ও কান্না শুরু করে দিল। আর হাতের কাছে যা পেল তা-ই আমার দিকে ছুড়ে মারলো।

অনেক কষ্টে সেদিন তাকে শান্ত করতে পেরেছিলাম।

অথচ আজ কতো সহজেই সে দূরে সরে যেতে চায়।

ভাবনার ঘোর কেটে গেল তার কথায়।

ও বললো, আমার জীবনটা নাকি ইনডিয়ান বাংলা সিনেমা *অচেনা অতিথি*-র নায়কের জীবনের মতো। আর সে কোনো অচেনা অতিথির সঙ্গে জীবনটাকে জড়িয়ে রাখতে চায় না।

চায়ের কাপে হাত দিতেই অনুভব করলাম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পানসে চা। খাওয়ার অনুপযোগী। অথচ দামটা ঠিকই দিতে হবে। ঠিক একইভাবে এ প্রবঞ্চনার দামও আমাকে সারা জীবন হয়তো দিতে হবে যা কোনো কিছু দিয়ে পরিশোধ করা যাবে না।

মেডিকাল কলেজ, ময়মনসিংহ থেকে

ফেলে দেয়া পাতা

– মাছুম আলম

রিজভী যখন ঢাকা থেকে সিলেট এলো তখন চা বাগান দেখে মুগ্ধ। এয়ারপোর্ট থেকে নগরীতে ঢুকতে লাক্কাতুরা চা বাগান দেখেই যে এতো মুগ্ধ হয় সে শ্রীমঙ্গলের বিস্তৃত বাগান দেখলে কি বলবে তা আন্দাজ করা মুশকিল। শ্রীমঙ্গল ঘুরে রিজভী বলেই ফেললো, আমি চা বাগানের প্রেমে পাগল হয়ে গেছি।

বাগানের প্রশংসা শোনার পর সমস্যা দেখা দিল রেস্টুরেন্টে যখন চা খেতে গেলাম। চা মুখে দিয়েই রিজভী বাংলা পাচের মতো মুখ বানিয়ে বেসিনে গিয়ে ওয়াক থু বলে সব চা ফেলে দিল। বিরক্ত ভাব নিয়ে বললো, এটা চা, না শরবত?

আসলেই চায়ে এতো বেশি চিনি দেয়া ছিল, তা কোনো ডায়াবেটিস রোগী খেলে নির্ঘাত ঝুকি দ্বিগুণ বেড়ে যেতো। ফেনসিডিল সেবীরাও এতো মিষ্টি চা খায় না।

এরপর রিজভীকে নিয়ে রাস্তার পাশের ইটালি হোটেল থেকে শুরু করে বেশ কয়টি নামিদামি রেস্টুরেন্টে চা খেলাম, রঙ চা থেকে দুধ চা সব। দুই তিনটি ছাড়া সব জায়গার চা রিজভীর কাছে গড়পড়তা বা খারাপ মানের মনে হলো। তার মতে, এর চেয়ে ঢাকার নীলক্ষেতের *সম্রাট হোটেল*–এর চা অনেক ভালো। চায়ের দেশে ভালো তৃপ্তিদায়ক চা না পেয়ে রিজভীর মন খারাপ।

তাকে বুঝিয়ে বললাম, ভালো চা সব বিদেশে রফতানি হয়ে যায় বা বাইরে উচু দামে বিক্রির জন্য চলে যায়। সিলেটে যে চা পাওয়া যায় তা দেশে বাজারজাতকারী কম্পানিগুলোর সাধারণ চা, সিলেটের চা বলে আলাদা কোনো চাও আমাদের এখানে নেই। ভালো, মোটামুটি ভালো আর খারাপ চা একত্রে মিশিয়ে দেশের বাজারে ছাড়া হয়। অবশ্য কম্পানির লেবেল বিহীন কিছু খোলা চা মাঝে মধ্যে পাওয়া যায় যা উন্নতমানের। শুনেছি চোরাই পথে কম্পানি থেকে বিদেশে রফতানির চা এভাবে বাইরে আনা হয়।

স্বপ্নের মতো সুন্দর চা বাগানের টাটকা স্মৃতি নিয়ে রিজভী ঢাকায় ফিরলো ট্রেনে করে। শ্রীমঙ্গল স্টেশনে পৌছার পর *চা লাগেনি চা, খুব ভালো চা* আওয়াজ শুনে খেয়াল করলো রিজভী।

লেভেল বিহীন শাদা পলিথিনে প্যাকেট করা চা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে কয়েকজন।

কেজি কতো বলতেই একশ ষাট টাকা চেয়ে বসলো।

দরদাম করে রিজভী নব্বই টাকা দিয়ে এক কেজি কিনে নিল। পরে ঢাকা থেকে রিজভী ফোনে যা জানালো তা খুব হতাশ আর করুণই শোনালো। ফুটন্ত পানিতে একটানা জ্বাল দেয়ার পরও চায়ের পাতা থেকে কোনো রঙ বের হয়নি। এক লিটার পানিতে প্রায় তিনশ গ্রাম চা পাতা দিয়েও লাভ হয়নি। বোকামির জন্য বাসার সবার কাছে রিজভী নাকি তামাশার পাত্র হয়ে গেছে।

ফোনে প্রতিউত্তরে রিজভীকে জানালাম, তোকে একটা কথা বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম, কিছু অসাধু লোক হোটেল, রেস্টুরেন্টের ফেলে দেয়া চা পাতা শুকিয়ে প্যাকেট করে ট্রেন ও বাসের যাত্রীদের কাছে বিক্রি করে দেয়। সরলমনাদের ঠকিয়ে আয়–রোজগার করাই এদের কাজ। দুঃখ নিস না, ওরা গরিব। চাইলেই তো কেউ ওদের নব্বই টাকা দেবে না। একটু ফন্দি–ফিকির করে না হয় ফসকিয়ে নিল।

বলদী, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট থেকে
mmalam1976@yahoo.com

অতঃপর

– মঈনুল আহসান

তখন আমি দুরন্ত এক বালক।

সেদিন বিকেলে কেন যেন বাইরে যাওয়া হলো না। সম্ভবত বড় আপাই বলেছিলেন বাসায় থাকতে। সন্ধ্যায় দোতলার ফ্ল্যাটে বেড়াতে যাবেন বলে।

আমাদের বড় আপার আবার পায়ে সমস্যা। হাটতে এটা–ওটা ধরতে হয়। সে জন্যই বোধ করি আমাকে রাখা। তিন তলা থেকে দোতলায় নামতে আমার সহায়তা লাগতেই পারে।

আমিও বাধ্য ছেলের মতো রয়ে গিয়েছিলাম ওই দোতলায় যাবার লোভেই। লোভের প্রথম কারণ ছিল, বেড়াতে গেলে প্রচুর সুখাদ্যসহ বিস্তর আপ্যায়ন পাওয়ার আশা। দ্বিতীয় কারণ ছিল, দোতলার পান্নাআপার সিক্রেট বের করা।

বড়আপার বান্ধবী দোতলার পান্নাআপা ছিলেন সুন্দরী। আমাদের বাসায় আসার অজুহাতে তিনি তিন তলার সিড়িতে দাড়িয়ে চুটিয়ে প্রেমালাপ করতেন চার তলার এক সুদর্শন বড় ভাইয়ের সঙ্গে। নিচে বা উপরের সিড়িতে পায়ের আওয়াজ পাওয়ামাত্রই পান্নাআপা ঢুকে যেতেন আমাদের বাসায় আর উপর তলার বড় ভাই রওনা দিতেন যে কোনো একদিকে।

ভাবটা এমন যেন ধোয়া দুই তুলসী পাতা। চলতি পথে হঠাৎ দেখা, তা এমন তো হতেই পারে।

তবে আমাকে সিড়ি পথে ছোটাছুটি করতে দেখলে ওনারা সরতেন না। চালিয়ে যেতেন প্রেমালাপ। বাধ্য হয়ে আমাকে ছুটতে হতো ওনাদের মাঝ দিয়ে।

একদিন তো দুজনের মাঝ বরাবর এসে হঠাৎ হেসে ফেলেছিলাম ফিক করে। আর যায় কোথায়! খপ করে দুজনে দুই হাত ধরে আটকে ফেলেছিলেন আমাকে। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই বাবু, হাসছো কেন?

আমি কি আর কথা বলি! ছুটে পালিয়েছিলাম কোনো রকমে।

আমাদের বড় আপা বোধহয় ব্যাপারটা আচ করতে পেরেছিলেন পান্নাআপার কারণে– অকারণে যখন–তখন আমাদের বাসায় ঢুকে পড়ার কারণে। তাছাড়াও রক্তে যখন জোয়ার আসে তার চিহ্ন কি আর চেহারায় ভাসে না? সে সময় চলন–বলনের চপলতাও অন্যদের চোখে ধরা পড়ে বৈকি।

সুতরাং বড় আপা যখন আমাকে নিতে চাইলেন পান্নাআপাদের বাসায়, ভাবলাম এ এক মাহেন্দ্র সুযোগ। দুই বান্ধবীর গল্পের ফাকে পেয়েও যেতে পারি বেফাস কোনো তথ্য।

অন্যদের কাছে ডলিআপা হিসেবে পরিচিত আমাদের বড়আপা শারীরিক প্রতিবন্ধী হলেও অসাধারণ মেধা, বিবিধগুণ আর অনন্য ব্যবহারের কারণে সর্বমহলে ছিলেন জনপ্রিয়। সেই বড়আপাকে যখন বিনা নোটিশে দোতলায় নামতে দেখলেন, মনে হলো পান্নাআপারা যেন হাতে আকাশের চাদ পেতে চলেছেন।

ব্যস্ত পান্নাআপা বড় আপাকে এগিয়ে নিতে এসে গোলাপি দুই গালে টোল তুলে কলকলিয়ে উঠলেন, ডলিআপা আসবেন, আগে বলবেন তো। আমি গিয়ে নিয়ে আসতাম। বাবু ছোট ছেলে, ও কি আপনাকে ধরতে পারে...।

অতঃপর বসার ঘরে শুরু হলো বান্ধবীদের প্যাচাল।

আ...ল্লা, ডলিআপা কি সুন্দর সেজেছেন.. কি সুন্দর লাগছে।

ইশ শাড়িটা কি সুন্দর, কোথে কে কিনলেন... দাম কতো...।

ডলিআপার হাতের আচার যে কি মজা...।

কিভাবে বানান...আজকে না শিখে ছাড়বো না ইত্যাদি।

কিছুক্ষণের মধ্যে পান্নাআপার সঙ্গে এসে যোগ দিলেন ওনার বড় বোন এবং রমণীকুলের বাক্যবাণ ছুটে চললো এক অজানা গন্তব্যে।

এদিকে আমার অবস্থা একেবারে কাবাব হাড্ডি। অবস্থা আরো করুণ হওয়ার কারণ হলো, ওই বিল্ডিংয়ের কোনো ফ্ল্যাটেই আমার বয়সী কেউ ছিল না। আমাকে খেলতে হতো অন্য বিল্ডিংয়ের ছেলেদের সঙ্গে মাঠে। এদিকে উঠতেও পারছি না, চাসহ সুখাদ্য বুঝি এখনই আসবে, উঠে গেলে মিস করবো এই আশংকায়।

কিন্তু সুপেয় সুখাদ্য দূরে থাক, খালি চাও যে আসে না।

একবার বড়আপার হাতে আস্তে ধাক্কা দিয়ে চেষ্টা করলাম ননস্টপ আলাপের মোড় ঘোরাতে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

গায়ের মশা মাছি তাড়ানোর মতো করে হাত ঝাড়া দিয়ে বড় আপা শুধু বললেন, আরেকটু বস, একটু পরেই উঠবো।

আমি ভাবি কি, আর বড়আপা বলেন কি!

কিন্তু নিতান্তই ক্ষুদ্র আমার মতো বাবুর পক্ষে ওখানে অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

এদিকে পান্নাআপারা যে একটু ভেতরে গিয়ে চা নাশতার কথা বলবেন বা নিজেরা বানিয়ে আনবেন তারও কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। কথার ঝরনা ঝরছে তো ঝরছেই।

আমি বেচারা অসহায়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি যেন... *সুবর্ণ কংকন পড়া ফর্শা রমণীরা কলকলিয়ে চলেছে...*।

কিন্তু আর কাহাতক!

এবার বড় আপাকে আরেকটা ধাক্কা দিয়ে বেশ জোরেই বলে ফেললাম, এই বড়আপা, এরা চা দেবে কখন?

আর যায় কোথায়!

তন্বী–তরুণী, লাস্যময়ী পান্নাআপা সোফা থেকে সটান দাড়িয়ে শশব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন,

হ্যা হ্যা বাবু, চা এই আসছে।

তারপর বসার ঘর থেকেই পাড়লেন হাক এই বুয়া এখানে চা বিস্কিট... শিগগির...।

বলতে বলতে সারা দেহে ঢেউ তুলে চপল পায়ে তিনিই ছুটে গেলেন ভেতরে হয়তো বুয়াকে ভালো ভাবে বলার জন্য।

বড়আপা এদিকে লা জবাব। একবার শুধু কটমট চোখে আমাকে দেখে নিয়ে দ্রুত ঘটনার মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করলেন...।

আরে ধুত্তরি ছিঃ ছিঃ... এই পান্না, চা–টা লাগবে না। এই আমরা উঠলাম। কিন্তু এমনতর ডাইরেক্টর একশনের পরা ওরা কি আর উঠতে দেয়!

বড়আপাকে জোর করে বসানো হলো। অবশ্য চায়ের গরমে আলাপ আর এগুলো না।

লজ্জায়, অপমানে বড় আপার লম্বা মুখ আরো লম্বা হয়ে মাথাটা নিচু হয়ে গেল। এক ফাকে শুধু ফিশফিশিয়ে বললেন, দাড়া বাসায় গিয়ে নিই...।

অবস্থা বুঝে বড়আপাকে সহজ করতে উঠে পড়ে লাগলেন পান্নাআপারা দুই বোন। দুজন পাল্লা দিয়ে বলে চললেন, আরে, ডলিআপা এমন করছেন কেন, আমরা কিছুই মনে করিনি। বাবু তো বাচ্চা ছেলে, না বুঝে বলেছে। আর ভুল তো কিছু বলেনি। আমাদেরই তো খেয়াল করা উচিত ছিল। আরো আগেই চায়ের কথা বলতে হতো। বাবু বলাতে তো ভালোই হয়েছে...

অতঃপর চা এলো, বিস্কিট এলো।

বড়আপা খেলেন কি না বোঝা গেল না।

কিন্তু আমি বেচারা পেট ঠাণ্ডা করতে ভুল করলাম না। এবং খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র, ভো দৌড়। পরবর্তী তিন দিন ছিলাম আপাদের ধরাছোয়ার বাইরে।

ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন, ক্যালিফোর্নিয়া
লস এঞ্জেলেস, ইউএসএ থেকে
mainulah@usc.edu

অবুঝ চাষী

– খ ম মুস্তাফা আহমেদ

ঠাকুরগাও জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলাম। সম্ভবত ক্লাস ফোরে। স্কুল থেকে পিকনিকে যাবে তেতুলিয়ায়। বন্ধুরা দুই একজন ছাড়া সবাই যাবে। আমিও যাবার জন্য আব্বুকে বললাম। টাকার পরিমাণ ডাবল বললাম। একশ পঞ্চাশ টাকা চাদা, বাকিটা হাতখরচ।

আব্বু টাকা দিতে নারাজ। তাছাড়া আমাকে একা ছাড়তেও রাজি নন। কারণ আব্বু আমাদের ভাইদের মধ্যে আমাকে বেশি ভালোবাসতেন। তিনি আমাকে হারাতে চান না।

আমিও নাছোড়বান্দা। যাবোই যাবো।

তার আগে বলে নেয়া ভালো, ছোটবেলায় মুরগি পালতাম। সেই মুরগির বাচ্চা হয়েছিল ছয়টা। এর মধ্যে দুটা মুক্তহস্তে দান এবং চারটা বাজারে বিক্রি না করে আব্বার কাছে বিক্রি করি দুইশ টাকায়। আমার সেই টাকা চাইলাম আমার পিতাজানের কাছে। এদিনই প্রথম ধমকের সুরে কথা বলেছিলাম।

তিনি আমাকে বললেন সতেরো ঘরের নামতা বলো।

এটাতে দুর্বল ছিলাম। তাই বলতে পারলাম না। আমাকে কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে পড়তে বসিয়ে দিলেন।

পরে বড় ভাইয়া সব শুনে বললেন, *ম্যায় হু না।*

তিনি টাকা দিলেন।

পিকনিকে গেলাম। কিন্তু বন্ধুরা আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেললো। তারা রিকশায় করে রেস্ট হাউস থেকে অদূরে ইনডিয়ার মাটিতে অবস্থিত চা বাগান দেখতে গেল। ফিরে এসে আমাকে চা বাগানের কথা বললে একাই একটা রিকশা নিয়ে চা বাগান দেখতে গেলাম।

এর আগে কখনো চা গাছ দেখিনি। একটা চায়ের গাছ তুলে আমার জ্যাকেটের ভেতরে রাখলাম, সঙ্গে কয়েকটা পাথর নিলাম। চা বাগানের পাশে একটা পাথরের স্তূপ ছিল এবং পাথরগুলো দেখতেও সুন্দর।

পাথর বাছাই করার সময় একজন বিএসএফ আমার কাছে এলো। আমি স্কুল ছাত্র দেখে বাছাই করা পাথর থেকে দুটো পাথর দিয়ে বিদায় করে দিল।

রেস্ট হাউসে ফিরলাম।

যদিও সে সময় শীত তবুও দুপুরের কড়া রোদেও গা থেকে জ্যাকেট খুলতে পারলাম না কারণ আমার জ্যাকেটের ভেতরে একটা চা গাছ। সেটা বাসায় নিয়ে যাবো।

রাতে এসে ঘামে ভেজা জ্যাকেট খুলে চা গাছ বের করলাম। সেটা বাসার একটা কোণে রোপণ করলাম দুপাশে দুটো পাথর দিয়ে।

আমার কাণ্ড দেখে ভাইয়া বললেন, এই গাছটাকে বাচাতে পারলে তোকে পাচ হাজার টাকা দেবো।

দিন-রাত সব সময় গাছের যত্ন নিতাম। কিন্তু সপ্তাহ খানেকের মধ্যে গাছের কোনো চিহ্ন থাকলো না। এতে খুব মন খারাপ হলো। টাকাও পেলাম না।

অবশেষে বড় ভাইয়া বললেন, আরে মফিজ, চা গাছ জন্মায় পাহাড়ি এলাকায়। তোর বাপ কি পাহাড়ে বাড়ি বানাইছে, তোর বাপের বাড়িতে চায়ের বাগান বানাবি!

কল্যাণপুর, ঢাকা থেকে

হারানো সুযোগ

– মোহাম্মদ জাকির হোসেন রাসেল

আজ থেকে প্রায় ছয় বছর আগের কথা। আমি তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র। একদিন আমার ছোট ফুপু ও ফুপা আমাদের বাসায় বেড়াতে এলেন। রাতে খাওয়া–দাওয়া শেষে ফুপা আমাকে সিনেমা হলে ছবি দেখতে যেতে অফার করলেন।

আমিও জীবনের প্রথম সিনেমা হলে গিয়ে বাংলা সিনেমা দেখবো বলে রাজি হলাম। ফুপার বয়স তখন পয়তাল্লিশ বছর। সর্বশেষ বাংলা সিনেমা দেখেন সাতাশ বছর বয়সে। প্রায় আঠারো বছর পর একটি লোক সিনেমা দেখতে যাবেন। কাজেই তার সঙ্গে সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতাই আলাদা।

আসল ব্যাপার হলো, আমি বিনা পয়সায় সিনেমা দেখবো! ভাবতেই খুশিতে বাকবাকুম।

যাই হোক। বাসায় বাবা–মাকে মানিয়ে সিনেমা দেখতে বেরুলাম। রাত সাড়ে দশটার শো দেখবো। ফুপা বললেন, চলো চা খেয়ে যাই, নইলে ঘুম পাবে।

আমরা গফরগাও রেলস্টেশন সংলগ্ন একটি হোটেলে ঢুকলাম।

ফুপা ওয়েটারকে ডেকে কড়া মিষ্টি ও দুধ বেশি দিয়ে দুই কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন।

চা এলো।

ফুপা এক হাতে সিগারেট, এক হাতে চায়ের কাপ নিয়ে বেশ আয়েশি ভঙ্গিতে চা পান করছেন।

আমি তখনো চা ঠাণ্ডা করতে ব্যস্ত।

ফুপার চা প্রায় শেষ।

তখন বাধ্য হয়েই চা–তে চুমুক দিই। আর তখনি ঘটলো আসল ঘটনা। এখানে বলে নেয়া ভালো যে, এটা ছিল আমার জীবনের প্রথম চা পানের অভিজ্ঞতা।

প্রায় কোয়ার্টার কাপ গরম চা আমার মুখে ঢুকে গেল। এক চুমুকে যে এতোটা চা মুখে ঢুকবে তা আমার আন্দাজ ছিল না। একদিকে মুখ ভর্তি গরম চা, অন্যদিকে হোটেল ভর্তি লোকজন। এ অবস্থায় যদি মুখ থেকে চা ফেলে দিই তবে সবাই হাসাহাসি করবে। এই ভেবে গরম চা–ই গিলে ফেললাম। আমার মনে হলো শক্তিশালী এসিড বুঝি মুখ থেকে পাকস্থলি পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিল। চোখে অন্ধকার দেখলাম। কি যে যন্ত্রণা হচ্ছিল তা বলার মতো নয়।

চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছে, অথচ কান্নার শব্দ হচ্ছে না।

আমার চোখে পানি দেখে ফুপা জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার?

বললাম, ফুপা, প্রচণ্ড পেটব্যথা করছে।

সত্য বললে তিনিও হয়তো বা হাসতে শুরু করতেন।

ফুপা বললেন, তাহলে চলো আজ আর সিনেমা দেখবো না।

এতে খুব কষ্ট পেলাম। তারচেয়েও কষ্ট পেলাম বেশ কয়েকদিন যখন আমার স্বাভাবিক খাবার–দাবার বন্ধ ছিল। বাড়িতে না বলে উপায় ছিল না।

শোনার পর সবাই সে কি হাসাহাসি। আমি শরমে মরে যাই আর কি! সত্যি বলতে কি, ওই দিন আমি যে সুযোগ দুটি হারাই তার জন্য আজও পস্তাতে হয়।

এক. বিনা পয়সায় প্রথম সিনেমা দেখা।

দুই. ফুপার সঙ্গে সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা।

ফুপার সঙ্গে আর কখনো সিনেমা দেখা হয়নি আমার। অথচ এখন সিনেমা দেখতে ইচ্ছা হয় না। এখন রোজ পাচ ছয় কাপ চা পান করি।

গফরগাও, ময়মনসিংহ থেকে

ছন্দময় বাগানে ছন্দপতন জীবনের

– সৈয়দা সায়মা আহমদ

আমার জন্ম চা বাগানে। শান্ত, নির্মল, নৈসর্গিক পরিবেশে। আমাকে আয়া সুন্দর পরিপাটি করে বাগানের বাংলোর বড় বারান্দাতে দোলনায় শুইয়ে রাখতো। কিন্তু এই জীবনটা বেশি দিন পাইনি। বছর দুয়েক বয়সেই আমার বাবাকে হারিয়েছি।

বাবা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে শহীদ হন। একে তো বাঙালি ছিলেন, ক্লাবে ও নানান জায়গায় দেশের কথা, দশের কথা বলতেন সহকর্মীদের কাছে। এতেই চা বাগানের পাকিস্তানি ম্যানেজারের বিরাগভাজন হন তিনি।

আমার মা হারিয়েছেন তার সাজানো, ছন্দময় চা বাগানের জীবন। নানা ছিলেন চা বাগানের মালিক। সেই সূত্রে মায়ের জন্ম চা বাগানের পরিবেশে। অন্যান্য চা বাগানে তিন চারবার গেছি। নানার বাগানে স্কুল বন্ধ হলেই বেড়াতে যেতাম। কিন্তু যখনই গেছি, মনে হয়েছে কচি পাতার মিষ্টি সুবাস, পাহাড়ি ঢালে চায়ের বাগান আর তার ফুলের সৌন্দর্য মনকে আকর্ষণ করে তীব্রভাবে। আবার মনকে বিষণ্ণও করে দেয়। মনে হয় এখানেই তো জন্মেছিলাম আমরা তিনটি ভাইবোন। আমার একমাত্র ভাইয়ের স্মৃতি আরো উজ্জ্বল। তখন তার বয়স ছিল সাত বছর।

ছোটবেলায় নানাবাড়িতে বেড়াতে যখন যেতাম তখন আমাদের মূল আকর্ষণ ছিল নানার চা বাগানের ফ্যাক্টরিতে যাওয়া। ফ্যাক্টরিতে ঢুকেই চা পাতার মিষ্টি সুবাস আচ্ছন্ন করতো আমাকে। কাচা চা পাতা একদিন বন্ধ ঘরে ট্রেতে করে রাখা হয় Fermentation (ফার্মেনটেশন) হওয়ার জন্য। এরপর পাতাগুলো কাটিং মেশিনে কুচি করে কাটা হয়, তারপর ড্রাইয়ার ট্রে-তে পাতা শুকানো হয়। তখন যে সুবাস আসে চা পাতার মিষ্টি সুবাস চারদিক ছড়িয়ে পড়তো। এরপর চালুনি মেশিনে চেলে ফেলা হয়, শেষে রূপান্তরিত হয় শুকনো চা।

নানার ফ্যাক্টরিতে চা মাপার একটা যন্ত্র ছিল। বিশাল দুটো চাকা লাগানো। ওটাতে চড়ে সারা ফ্যাক্টরিতে ঘুরে বেড়াতাম। এতে ওজন নিতাম। সেটা চক দিয়ে ফ্যাক্টরিতে লিখে রাখতাম। যাতে পরের স্কুল ছুটিতে এলে আবার ওজন নিয়ে মিলিয়ে দেখতে পারি।

নানার ওখানে বাগানের চৌকিদার সময়ের ঘণ্টা বাজাতো। আরো বাজতো বিকেলে শ্রমিকদের পাতা তুলে নিয়ে আসার সময় ও সকালে হাজিরা দেয়ার সময়ে। এখন যখন লিখছি, ঘণ্টার সেই শব্দ যেন কানে বাজছে। বিকেলে আমরা সব খালাতো, মামাতো ভাইবোন মিলে বাগানে বেড়াতে যেতাম। বর্ষার দিনে বাগানের রূপ, সৌন্দর্য কি যে ঐশ্বর্যময় তা না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। শীতের রূপ আরেক রকম, কুয়াশায় ঢাকা ভোরের চা বাগান আর বাংলো, নানান রঙয়ের বাহারি ফুলের সমাহার।

মায়ের কাছে শুনেছি আয়া প্রতিদিন বিকেলে তাজা বেলি ও গোলাপের মালা গেথে দিতো এবং মা সেটা খোপায় পরতেন।

চা বাগানের বাংলোতে গেলে একরাশ কষ্ট এসে ভিড় করে মনে। হানাদাররা কোথায় ফেলে গেছে আমার বাবাকে তাও আজ পর্যন্ত জানি না আমরা। আমার অসীম সাহসী, ধৈর্যশীলা মায়ের সব হারানোর কষ্ট আরো তীব্র হয় ওখানে গেলে।

উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা থেকে

চায়ের আড্ডায় একটি SMS

– তানিয়া সুলতানা রিমা

ক্রমেই আসরটি বেশ জমে উঠলো। আড্ডা দিচ্ছিলাম আমি, ঝুমা, লাবনী, পলি, ইয়াসমিন, শান্তা ও শিমুল। সম্প্রতি শিমুলের এনগেজমেন্টের ফল স্বরূপ এই চায়ের আসর। চায়ের নিমন্ত্রণ হলেও রীতিমতো ভুরিভোজ করানো হলো আমাদের। এবং সবশেষে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে শুরু হলো তুমুল আড্ডা।

বললাম, জানিস, এক সময় এই চা ছিল আমার দুই চোখের বিষ।

সবিনয়ে প্রশ্ন সবার, কেন?

বললাম, আমার তিন আপু এবং একমাত্র ভাইয়াটির গায়ের রঙ একেবারেই ফর্শা আর আমি ছিলাম উজ্জ্বল শ্যামলা। তাই যখন ছোট ছিলাম তখন ওরা সবাই মিলে আমাকে এই বলে ক্ষেপাতো, আমাকে নাকি আব্বু-আম্মু পালতে এনেছেন। তাই আমার গায়ের রঙ শ্যামলা।

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাগে-দুঃখে কান্না শুরু করে দিতাম।

তখনই আম্মু দৌড়ে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতেন, তোকে কুড়িয়ে পাবো কেন? তুই তো আমার সাত রাজার ধন। তোর গায়ের রঙটা না হয় একটু চাপা। কিন্তু তোর মতো মিষ্টি মেয়ে কি দশ গ্রামে আছে?

আম্মুর কথায় সান্ত্বনা খুজে পেলেও লোক মুখে শুনতাম, চা খেলে গায়ের রঙ কালো হয়ে যায়। তাই চা থেকে সব সময় একশ হাত দূরে থাকতাম। কিন্তু বড় হওয়ার পরে যখন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা পড়তে শুরু করলাম তখন জানলাম, চা খেলে গায়ের রঙ তো কালো হয়ই না, বরং হরেক রকম উপকার পাওয়া যায়। শরীর, মন সতেজ করায় চায়ের ভূমিকা তুলনাহীন। পরিমিত পরিমাণে চা পান করলে হৃদ রোগের ঝুকি কমে যায়, হৃদযন্ত্র অনেক বেশি সক্রিয় থাকে। চায়ে আছে প্রচুর ফ্লোরাইড। এই প্রাকৃতিক উপাদান দাত এবং মাড়ি উভয়েরই উপকার করে। এসব বিভিন্ন উপকারিতার কথা পড়ার ফলে আমার ফেভারিট ড্রিংকের তালিকায় চায়ের আগমন ঘটলো।

বন্ধু মহলে বিউটিশিয়ান উপাধিপ্রাপ্ত লাবণী বললো, রূপচর্চার ক্ষেত্রেও চা অতুলনীয়। চায়ের নির্যাস রুটিন মেনে মাখলে ব্রন হবে না। বড় দুই চামচ লিকারের সঙ্গে এক বড় চামচ কমলা লেবুর রস মিশিয়ে সপ্তাহে অন্তত একদিন চুলের গোড়ায় ঘষলে চুলের আয়ু বহুগুণে বেড়ে যাবে। চা দিয়ে যে ফেশিয়ালও তৈরি করা যায় সেটা জানিস? প্রথমে দুইটি কাঠালি কলা চটকে তার মধ্যে এক চামচ মধু ...।

চুপ করতো বিউটিশিয়ান বলে এক ঝাড়িতে ওকে থামিয়ে দিল পণ্ডিত মশাই উপাধিপ্রাপ্ত ঝুমা। বললো, সেদিন চায়ের জন্ম ইতিহাস নিয়ে পত্রিকায় একটা চায়নিজ রূপকথা পড়লাম। সেটা বলছি শোন।

শেন নং নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি দক্ষ প্রশাসক এবং বিজ্ঞানীও ছিলেন। ২৭৩৭ খৃস্টপূর্বের কথা। তিনি দূরের এলাকা পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। এক দুপুরে ক্লান্ত রাজা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। খাওয়ার পানি ফোটানো হচ্ছিল। রাজা দেখলেন, বুনো ঝোপ থেকে কিছু শুকনো পাতা উড়ে এসে পড়লো

ফুটন্ত পানিতে। বাদামি হয়ে গেল পানির রঙ। ওই পানি খানিকটা চেখে দেখলেন রাজা, মুহূর্তে ক্লান্তি দূরে হয়ে গেল। রাজা তখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রায় দিলেন, শরীরকে চনমনে করে তুলতে অতুলনীয় এই পাতা। সৃষ্টি হলো চা...।

ঝুমার বলা গল্প শেষ হতে না হতেই ছন্দময় টুং টাং এক আওয়াজ এলো শিমুলের মোবাইল থেকে। SMSটি রিসিভ করে মৃদু হেসে উঠলো শিমুল। তোদের হবু দুলাভাইয়ের SMS।

আর যায় কোথায়? চিলের মতো ছো মেরে ওর হাত থেকে মোবাইলটা কেড়ে নিল সন্ত্রাসী উপাধি প্রাপ্ত পলি।

সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম মোবাইলের ওপরে।

জোরে জোরে আবৃত্তির ভঙ্গিতে পড়তে লাগলাম SMSটি।

It goes in dry and comes out wet ... The longer it stays in, the stranger it gets. When it comes out it drips and sags...

এই পর্যন্ত পড়ে লজ্জায় লাল, নীল, বেগুনি রঙ ধারণ করে চুপ করে গেলাম। সবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওদের অবস্থাও আমার মতোই।

কেবল ব্যতিক্রম ফটকা উপাধিপ্রাপ্ত শান্তা। ও হাসি-হাসি মুখে বলে উঠলো, Our হবু দুলাভাই is so romantic! আমাকে দে তো। বাকিটুকু পড়ি। বলেই মোবাইলটা হাতে নিয়ে সে জোরে জোরে পড়তে লাগলো, It is not what u think. It is Lipton tea bag!

SMSটির শেষ অংশটুকু পড়ে থমকে গেল শান্তা।

পর মুহূর্তেই আমাদের হাঃ হাঃ হিঃ, হিঃ, হোঃ হোঃ, হেঃ হেঃ সব রকমের হাসিতে পুরো বাড়িটিই বুঝি কাপতে লাগলো।

ঠিক এমন সময় বন্ধু মহলে কবি-সাহিত্যিক উপাধিপ্রাপ্ত এই আমার মাথায় যে ভাবনাটি এলো, সেটা হলো, আহা রে! আমাদের জীবনটা যদি চায়ের আড্ডার মতো শুধুই হাসি-আনন্দে ভরে থাকতো!

চরফ্যাশন, ভোলা থেকে

তরিতরকারীময়

– মোঃ শাহাবুদ্দিন

এক আত্মীয়ের বিয়েতে বরযাত্রী সেজে গিয়েছিলাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হাওড়-বাওড় ঘেরা নিভৃত এক গ্রামে। লোকটা এক সচ্ছল গৃহস্থ। বহু জমির মালিক। কিন্তু নিরক্ষর। পরিবারের কেউ-ই পড়ালেখা জানে না। ওদের কেউ-ই বছরে একবার কি দুবারও শহর-গঞ্জে যায় বলে মনে হয় না। তবে একটা সরলতা ওদের মধ্যে দেখেছিলাম সেদিন।

বিয়ে পড়ানোর শেষে জিয়াফৎ খাওয়া। মানে গ্রাম্যভোজ। অনেক লোকে খেলো। মাটিতে পাটি পেতে বসে কলার পাতায় খাওয়া। দুটো কলার পাতা এক সঙ্গে। একটায় ভাত, মাংস, তরকারি, ডাল খাওয়া। শেষে অন্যটায় মিষ্টান্ন ক্ষীর, পায়েস খাওয়া। এভাবে প্রচুর লোকের খাওয়া শেষে গায়ের সাধারণ নিমন্ত্রিত লোকেরা চলে গেলে আমাদের বরযাত্রীদের নিয়ে বাসর ঘরে আলাদা করে আপ্যায়িত করা হলো গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী চা দিয়ে।

দেখি ইয়া বড় ডেকচি ভরে চা রান্না করে নিয়ে আসা হয়েছে। ঢাকনা খুলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতর থেকে সুন্দর একটা ঘ্রাণ মৌ মৌ করে দিল ঘরের পরিবেশটাকে। তারপর বড় বড় বর্তন খোলাওয়ালা থালা সবার সামনে একটা করে দিয়ে যেতে লাগলো খাদিমদার। এরপর বড় চামচ দিয়ে ডেকচি থেকে চা উঠিয়ে সবার পাতে দিতে থাকলো।

ও খোদা, চেয়ে দেখি চায়ের ঘন লিকারের মধ্যে আলু, বেগুন, শাক ইত্যাদি তরকারি কুচি কুচি করে কাটা, ভাসছে রীতিমতো। ওগুলো দিয়েই বনেদিভাবে রান্না করা হয়েছে চা।

আমাদের মধ্যকার অনেকেই ওই চা আর খাদিমদারদের প্রত্যেকের থালায় থালায় ওস্তাদি পরিবেশনের একটা কৌশল দেখে চোখ বড় করে ফেলেছে। যুবকদের কেউ কেউ মুখ টিপে হাসারও চেষ্টা করছে। কিন্তু নতুন কুটুম বাড়ি, নতুন আত্মীয় বিধায় জোর করে সে হাসি চেপে রাখার কসরৎও করে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে।

যাহোক, তরিতরকারি দিয়ে অতি আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রামীণ বধূদের হাতের রান্না করা থালা ভর্তি চা হাপুস–হুপুস করে খেয়ে চায়ের একটা অন্য রকম স্বাদ যে সেদিন না পেয়েছিলাম তা নয়।

মুকুন্দিয়া, রাজবাড়ী থেকে